বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা | জানুয়ারী-মার্চ 1996 | পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায়

ব্যাধিগ্রস্থ বিজ্ঞান

পানীয় জলের গুণাগুণ

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি

পাগলা গরু রোগ

আবর্জনার পুনর্ব্যবহার

সেলুলার ফোনের কথা

যৌন-কর্মীদের সংগ্রাম

অর্চনাদের দু'দশকের লড়াই

আমাদের কথা

ছোট পত্রিকা মানেই হাজারো সমস্যার মধ্য দিয়ে চলা। সমস্যা নিয়ে চলা। তবু চলে। যাহোক করে হলেও। চলে কারণ যত ছোটই হোক, ছোট পত্র-পত্রিকা চলার পেছনে থাকে কিছু তাগিদ। কিছু লক্ষ্য। —ব্যবসায়িক নয়, সবাই বোঝেন। থাকে অন্য কিছু। সেই কিছুর আদলটা সব মুহূর্তে খুব স্পষ্ট থাকে এমনও নয়। তবুও 'কিছু একটা আছে' এই যান্ত্রিক বিশ্বাসেই চলে পত্রিকা। স্বভাবতই এর ছাপ পড়তে বাধ্য পত্রিকার পাতায়। আসলে পত্রিকা প্রকাশনার নানান হ্যাপা—বিশেষ করে চারপাশের বিরুদ্ধতার মধ্যে এবং অবশ্যই নিজেদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, এই অস্পষ্টতাকে প্রকট করে তোলে মাঝে মধ্যে। হোঁচট খেতে হয় বন্ধুদের 'হচ্ছেটা কি' ধরণের বেয়াড়া প্রশ্নের মুখোমুখি হলে। সম্প্রতি এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল পত্রিকা ছাপানো-ছুপনোয় গতর খাটায় যারা তাদের। ফলে একটু নড়েচড়ে বসতে হল। এবং তাকাতে হল পেছনে ও সামনে।

'বিওবি' শুরু হয়েছিল সেই সত্তরের দশকে। তখন ভাবনা কিছু অবশ্যই ছিল। তখনকার সময়, পারিপার্শ্বিক এবং স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চেতনা ও প্রবণতা অনুযায়ী।- তারপর কেটে গেছে অনেকটা সময়। অতিক্রান্ত সময়ের দুই প্রান্তে পারিপার্শ্ব এক থাকেনি। থাকেনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনোজগতের অবস্থান ও অনুভব। সমস্যা ও সঙ্কটকে দেখার দৃষ্টিকোণ। যে বিষয়কে জানা-বোঝার সীমার মধ্যে মনে হত—এখন মনে হয় ধূসর। জানিনা হয়তো তখনও ধূসর ছিল; ভাবতাম জানি বলে। হয়তো কোন আচ্ছন্নতার কারণে এই বিভ্রম।

তবে বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কল্যাণকারী ভূমিকা সম্পর্কে নিঃসংশয়ী ছিলেন যারা—'বিওবি' কখনই তাদের দলে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা, রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা-700 089
ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি-22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা-700 091
ফোন—359-0297

ছিল না। এমন কি যারা মনে করতেন ব্যবহারকারীর দোষেই বিজ্ঞানের এই হাল—ক্ষমতার হাত বদল হলেই সমস্যার সমাধান হবে, বিজ্ঞানের কল্যাণকারী রূপ প্রকাশ পাবে, তাদের সাথেও খুব একটা ঘেঁষাঘেঁষি করেনি বিওবি কখনও।

আজ বন্ধুদের এই 'হচ্ছেটা কি' প্রশ্নের আড়ালে হয়তো আছে আমাদের ভাবনার প্রতি অসমর্থন। অথবা অতৃপ্তি। তবে টুকরো কথা ও মন্তব্য থেকে অনুমান করছি দ্বিতীয় আশংকাটাই ঠিক। তাদের অভিযোগ, সমস্যাটিকে বিওবি যেভাবে দেখছে তা এতটা সরল নয়। আরও গভীর এবং জটিল। কারণ বিজ্ঞান আজ কেবল মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত করেই ক্ষান্ত নয়, সে তার destiny-কেও নির্ধারণ করতে উদ্যত। ফলে নতুনভাবে এর বিচার বিশ্লেষণ অনুধাবন প্রয়োজন। 'বিওবি' সেকাজ করছে না। করা উচিত।

বিওবি'র তরফে জবাব—সে তো বড় সহজ কাজ নয়। ইতিহাস দর্শন সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির আলোয় ফের নতুনভাবে খতিয়ে দেখতে হবে সব কিছু! বিওবি'র মত ক্ষুদ্র অস্তিত্ব দিয়ে কি সম্ভব সে কাজ? বন্ধুদের ফিরতি জবাব—শুরু করায় অসুবিধে কোথায়? ফলে মানতে বাধ্য হচ্ছি তাদের যুক্তি।

এখন প্রশ্ন কিভাবে শুরু করা? কোন্ প্রশ্ন ধরে শুরু করা? এ ব্যাপারে বিওবি'র তাবৎ পাঠক বন্ধু শুভানুধ্যায়ী সকলের কাছেই রাখছি এ প্রশ্ন। বিজ্ঞানের তথা আজকের প্রযুক্তির ভূমিকা আমরা সকলেই কম বেশী অনুভব করছি। ভাল মন্দ দু'দিক থেকেই। অনুভব করছি একদিন ভাবনা ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-চর্চার সুফলকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। আজ আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি কি দিতে পারছে তার নিরিখেই ঠিক হচ্ছে মানুষের কি প্রয়োজন, কেমন হবে জীবনযাপন এবং কোন লক্ষ্যে? এর অন্তর্নিহিত দার্শনিক সমস্যা ছাড়াও এতে বাস্তব সমস্যাও বড় কম নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এভাবে চললে ক্ষুদ্র পৃথিবীটাই ধ্বংস হবে একদিন।

(শেষাংশ 31 পাতায় দেখুন)

সূচীপত্র

দেবতার ব্যাধি / অমিতাভ বসু রায়—3 □ বিষয় পরিবেশ / রবীন মজুমদার—14 □ বামফ্রন্টের শিল্পনীতি / রবীন চক্রবর্তী—21 □ পরিক্রমা—(ম্যাড-কাউ-ডিজিস, রিসাইক্লিং, সেলুলার ফোনের হাল)—25 □ মহিলা যৌন-কর্মী সম্মেলন / প্রতিবেদক—28 □ অর্চনা মামলা / র. চ.—29

দেবতার ব্যাধি

অমিতাভ বসু রায়

[বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে চারপাশে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। ঝিমিয়ে গেছে উত্তাল প্রতিবাদী আন্দোলন। দুনিয়া জুড়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর হাল-চাল ও ঘরের কাছে 'বামপন্থীদে'র কাজকর্ম আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে কঠিন আঘাত হেনেছে। পৃথিবী জুড়ে তথাকথিত 'ক্ষয়িষ্ণু' সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার আমাদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে। রাজনীতি অর্থনীতি বা দর্শনের মত আমাদের বিজ্ঞান ভাবনাতেও দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়াটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে বিওবি।

বর্তমান প্রবন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসের পর্যালোচনা করে বর্তমান বিজ্ঞান চর্চার নানা সংকটের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শ্রীঅমিতাভ বসু রায়। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামতের বিশ্লেষণের সাথে সব জায়গায় সহমত পোষণ না করা সত্ত্বেও বিওবি-এর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে শ্রীবসু রায়ের বক্তব্য খানিকটা নতুনত্বের দাবিদার, তাই বিতর্কের আঙিনায় তাকে আনা দরকার। পাঠকদের কাছে আবেদন এ বিষয়ে আপনার মতামত খোলাখুলি জানিয়ে এ বিতর্ককে সমৃদ্ধ করে তুলুন। —সম্পাদকমন্ডলী, বিওবি]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নামে একটি গল্প আছে। এক ডাক্তারের গল্প, যে যৌবনে সেবাধর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তরুণ বয়সে অফুরন্ত উদ্যমে দীন দুঃখী আতুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল ডাক্তার। একবিন্দু কপটতাও ছিল না এই সেবায়। এভাবেই সে উঠে এসেছিল এক দেবতার আসনে। চারপাশের মানুষের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার ভাবাবেগে ভেসে ডাক্তারও নিজেকে দেবতা ভাবতে শুরু করল এক সময় এবং সেই মুহূর্তেই সবকিছু বিষিয়ে উঠল। ডাক্তার এক বিধবা যুবতীকে অসুস্থ অবস্থা থেকে সারিয়ে তুলেছিল, ফিরিয়ে এনেছিল মৃত্যুর দ্বার থেকে। কিন্তু দুদিন বাদে সেই যুবতী যখন কৃতজ্ঞতার বশে ফুল মিষ্টি নিয়ে ডাক্তারের কাছে এল, ডাক্তারের মনে কামনার উদ্রেক হল। রাতে সে যুবতীর ঘরে গেল। ডাক্তারের কামাতুর প্রস্তাবে শিউরে উঠল মেয়েটি, কিন্তু ডাক্তার কৃতজ্ঞতার দাম চাইলে দীনভাবে সেই নারী নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলো। ক্ষুধার্ত দেবতার কাছে মানুষ অসহায়। নিজ জীবনের এই পতন ডাক্তারকে ব্যথিত করে কিন্তু সাথে সাথে ডাক্তার উপলব্ধি করে দেবত্বের শক্তি। ডাক্তার নিজের জালে বন্দী। পালাতে চায় নিজসৃষ্ট জাল কেটে কিন্তু পারে না। তার বন্ধু মাষ্টার মশাইকে জানায় মানুষকে শুধু মানুষ হতে উপদেশ দেবেন। দেবতা হতে নয়।

যদিও এটি একটি গল্প, কিন্তু জীবনের এক গভীর রহস্যময়তার কথা এই গল্পে পাওয়া যায়। আমরা

যদি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাকাই তবে দেখব ভারতের গণজাগরণে সবচেয়ে বেশী অবদান যার সেই মানুষটির নাম গান্ধীজি। উনিই প্রথম সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে জাতপাতের বিচার এই দেশের সমস্ত সৃজনীশক্তির বিনাশ করেছে। এবং এই বিশেষ জায়গায় গুরুত্ব দেওয়ায় অতি অল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সারা ভারতজুড়ে এক গণজাগণের বন্যা আনা। কৃতজ্ঞ মানুষের চোখে উনি হয়ে উঠলেন গান্ধী দেবতা। কিন্তু গল্পের ডাক্তারের মত তিনিও বিশ্বাস করলেন নিজের দেবত্বে। তার পরবর্তী ইতিহাস আমাদের জানা। অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে রাত্রিযাপন করলেন নিজের সংযম পরীক্ষায়। একবারও ভাবলেন না, ভাববার প্রয়োজনবোধ করলেন না সেই মেয়েদের কথা। কারণ দেবতার শক্তির কাছে মানুষ অসহায়। গান্ধীজির জীবনের শেষ পর্বে আমরা দেখলাম ওনাকে দেবতার আসনে বসায়নি যারা, সেই সব মানুষের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিতেও তার অনীহা। এই ভাবেই দেশভাগের চরমবিরোধী, হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে যার আপাত অটুট বিশ্বাস, সেই মানুষটি হলেন দেশভাগের প্রতিবাদহীন মৌন সাক্ষী। যৌবনে মানব কল্যাণে নিয়োজিত আত্মত্যাগী বহু রাজনৈতিক নেতারই এ ধরণের রূপান্তর দেখা যায়। আর শুধু কি রাজনৈতিক নেতা ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে পারমানবিক বোমা তৈরী হলো। বৈজ্ঞানিকরা অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে মানুষের মুক্তির কথা ভেবে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় বোমা বানাবার ব্রত নিলেন, অনেক বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ কারিগরি ও তত্বগত জ্ঞানের সমন্বয়ে তৈরী হলো পারমানবিক বোমা। অনেক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকের ধারণা ঐ সময় অক্ষশক্তির বিনাশের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, ফলে বোমা বিস্ফোরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বেশ কিছু বৈজ্ঞানিকের মনে হলো পারমানবিক বোমা সত্যিই কি রকম, কতটাই বা তার ধ্বংসক্ষমতা জানা অত্যন্ত জরুরী। হিরোশিমায় মানুষ জানল বিজ্ঞানের শক্তি। মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান দেবতা। আর সেই দেবতার এক 'পূজারী' বিজ্ঞানী ফার্মি বললেন—বোমা হিরোশিমায় না ফেলে টোকিওতে ফেললে ভাল হতো, তা হলেই এর প্রকৃত ধ্বংস ক্ষমতা যাচাই করা যেত। একথা যদি সত্য হয় তবে প্রশ্ন জাগে বিজ্ঞানও কি ব্যাধিগ্রস্ত দেবতা যার প্রকাশ তার পূজারীদের মধ্য দিয়ে ? না এ ব্যাধি কোন একক বিজ্ঞানীর ? স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয় ? তবে কি দেশের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী এই সব মানুষ জীবনের অনেক সময় পার্থিব সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে যে সাধনা করেন সেই অবদমিত কামনাই কি বিকৃতির উৎস ? মনে হয় এতটা সত্য নয়, কারণ সব মানুষই ডাক্তারের মত দেবত্বের জালবন্দী নয়, সব বিজ্ঞানীও বিজ্ঞানের শক্তির দম্ভে আত্মহারা নয়।

আমরা বুনো রামনাথের কথা শুনেছি। দরিদ্র এই ব্রাহ্মণ ছাত্রদের শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। অভাব তাঁকে বিচলিত করে না। তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার শিক্ষাদানের ব্রত পালন করেন। তিনি সুখী। ওঁনার পান্ডিত্যের কথা এবং সেই সাথে দারিদ্র্যের কথাও রাজার কানে যায়, কিন্তু রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থী হতে উনি রাজী নন। রাজার প্রশংসাও ওনাকে স্পর্শ করে না। রাজা স্বয়ং ওঁর বাড়িতে এসে অভাবের বিষয় জানতে চাইলে বুনো রামনাথ জানান শাস্ত্র ও ব্যাকরণের কোন কোন জায়গার ওঁর জ্ঞানের অভাব আছে—সেই কথা। আশ্চর্য্য ব্যাধিহীন এক সাধক। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বুনো রামনাথ তার মন প্রাণ সব সঁপেছিলেন ছাত্র তৈরীর সাধনায়, অন্য কোন আকাংখা তার ছিল না। মন ও প্রাণের সমন্বয়, পদাবলীর ভাষায় 'আমার মন যে করে শ্যামের তরে পরাণে তা জানে' ছিল বুনো রামনাথের সাফল্যের চাবিকাঠি।

উপনিষদীয় দর্শনে বলা হয়েছে—সিদ্ধি তখনই সম্ভব যখন সাধনা আর কামনা এক হয়ে যায়। এর ব্যতিক্রমই ব্যধির কারণ। আমাদের দেশে এক চলতি বিশ্বাস আছে, যারা যোগের প্রাথমিক শক্তির পরিচয় পেয়ে সেই শক্তির প্রয়োগে নিজ ক্ষমতার প্রদর্শন করতে চায় তারাই যোগ ভ্রষ্ট হয়ে কাপালিকতা জাতীয় বিকৃতির শিকার হয়। এতে কতদূর সত্য আছে জানা নেই কারণ কাপালিকের জীবন দর্শন জানা নেই, তবে এই প্রচলিত বিশ্বাসের এক দার্শনিক

দিক আছে। সাধনার পথে যারা তাদের কামনাকে পরিচালিত না করতে পারে, অবদমিত কামনা তাদের যোগভ্রষ্ট করে। তারাই হয় ব্যাধির শিকার।

সমাজগঠনের আদিপর্ব—ধর্মদর্শনের বিকাশ

মানব সভ্যতার আদিলগ্নেই বিজ্ঞানের বিকাশ শুরু হয় যদিচ প্রথাগত বিজ্ঞানের জন্ম আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগে। প্রথম যেদিন বানুষ প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য্যকারণ উপলব্ধি করতে পারে, পারে সেই উপলব্ধিকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ঘটনার অনুমান করতে সেই দিনই হয় বিজ্ঞানের সূচনা। মানুষ প্রকৃতিকে প্রাথমিকভাবে জানে তার ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়। এই পরিচয়ে মানুষের নান্দনিক বোধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। বিশ্বচরাচরের নয়নাভিরাম দৃশ্য তার মনকে তৃপ্ত করে। বনের মর্মর ধ্বনি, পাখির কলতান বা নদীপ্রবাহের কুলকুল ধ্বনি তার মনকে আবিষ্ট করে। এই নান্দনিক বোধের এক সার্বজনীন চরিত্র আছে, ভিন্নদেশীয় মানুষের ভাষা পরস্পরের কাছে অবোধ্য, আচার ব্যবহার বা নীতিবোধ আলাদা কিন্তু সঙ্গীত কলাদি জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে সবার মনেই এক জাতীয় অনুভবের সৃষ্টি করে। রূপ-রস-গন্ধ মন্ডিত এই অপরূপ বিশ্ব মানুষের কাছে ধরা দেয় আর মানুষ তার উপলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তাকে বুঝতে করতে চায়। বিজ্ঞান বা দর্শন (আদিপর্বে বিজ্ঞানকে দর্শনের একটি বিভাগ হিসেবে গণ্য করা হতো) শাস্ত্রের বিকাশ হয়েছিল এই সত্যানুসন্ধানের পথ ধরে।

অন্যদিকে মানুষ শারীরিকভাবে দুর্বল, দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। যুথবদ্ধ জন্তুদের মত, শারীরিক ক্ষমতাই নেতা নির্ধারণ করে। জ্ঞানলাভের উষালগ্নেই মানুষ অনুভব করল অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ তার জীবনযুদ্ধকে সহজতর করে তুলতে পারে। এভাবেই ক্রমাগত জ্ঞানার্জন এবং জীবনধারায় তার প্রয়োগ মানুষকে এক সমাজবদ্ধজীবে পরিণত করল। জীবন ধারণের ধারাও বদলে গেল—শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হল। গোষ্ঠীগুলি আয়তনে বেড়ে ধীরে ধীরে জাতি গঠনের পথে এগুলো। এইভাবে গোষ্ঠী থেকে জাতি, তার থেকে আরও বৃহত্তর জাতি গঠনের প্রক্রিয়া সভ্যতার বিকাশের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে ধরা হলো। এভাবেই জ্ঞানের স্তরের সঙ্গে সামাজিক অবস্থান এক অদৃশ্য বন্ধনে বাধা পড়ল।

এই দুই উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও কিছু মানুষের মধ্যে এক বিশেষ উপলব্ধির জন্ম হলো। জ্ঞানী মানুষ অন্য সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী শক্তিশালী বুঝলেন তাঁরা। এভাবেই জ্ঞানীব্যাক্তিরা তাদের শক্তির দাবীতে শাসকের সাথে মিলে মিশে সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবান্বিত করলেন। গৌতম বুদ্ধ বা অ্যারিষ্টটল যে শুধুমাত্র জ্ঞানমার্গী ছিলেন তা নয় রাষ্ট্রনীতিরও প্রবক্তা তাঁরা। দার্শনিকরা (তৎকালীন জ্ঞানী ব্যাক্তিরা) সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে আরও উপলব্ধি করলেন যে মানুষের মনোজগতে একধরণের জাড্য আছে (চলতি অবস্থা বজার রাখার প্রবণতা)। তারা বুঝলেন মানুষের মনে যদি কোন স্থায়ী সংস্কার দানা বাধানো যায় যার ফলে তার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রবনতা বৃদ্ধি পাবে তবে সেই বৈশিষ্টকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম করা সম্ভব। কালক্রমে ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে এই সংস্কার। জগতের রহস্যময়তা ও জগৎস্রষ্টা বিষয়ে একপ্রকার শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের থেকে যদিও বা ধর্মের সৃষ্টি তথাপি শাসকশ্রেণীর প্রভুত্ব বজায় রাখার নীতিবোধ নিয়েই ধর্মের জয়যাত্রা। এর ব্যাতিক্রম যা আছে তা কখনই মূলস্রোতে আসতে পারে নি শাসকশ্রেণীর বিরোধিতায়। এইখানে মনে রাখতে হবে জ্ঞানের প্রসার মানুষের অনুসন্ধিৎসা বাড়ায় ফলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়, এ কারণেই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে দেখি ধর্মের সাথে জ্ঞানের সংঘাত।

উপজাতীয় সমাজ আকৃতিতে ছোট ছিল কিন্তু তাদের সামাজিক বন্ধন ছিল দৃঢ়। সমগ্র গোষ্ঠী একসাথে কাজ করত যেন সমগ্র গোষ্ঠীই এক অখন্ড সত্বা। ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রের ধারণা তখন জন্মায়নি। সামাজিক প্রথার একটা বাস্তব

শক্তি তারা উপলব্ধি করত। মানুষ যে গোষ্ঠী বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করত সেই জাতির ধর্মবিশ্বাসে তারা স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠত। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্মপ্রচারের কোন উদ্যোগ তখন দেখা যায় নি। এই উপজাতীয় ধর্মবোধগুলিকে সাধারণ ভাবে গোষ্ঠী ধর্ম বলা যায়। এইসব গোষ্ঠীধর্মে (জ্ঞানের অভাব জনিত) কুসংস্কার ছিল কিন্তু কোন আগ্রাসী ভাবনা ছিল না।

সমাজ বিবর্তনের যাত্রাপথ চিহ্নিত হলো দুটি গুণের দ্বারা। প্রথমত, শাসকশ্রেণী কর্তৃক বেশীর ভাগ মানুষকে শোষণ করা এবং দ্বিতীয়ত এক গোষ্ঠী দ্বারা অন্য গোষ্ঠীকে পদানত করে বৃহত্তর জাতি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। এ দুয়ের ক্ষেত্রেই ধর্ম এক গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করল। দর্শন চর্চার মূল স্রোত গড়ে উঠল ধর্মদর্শনকে কেন্দ্র করে। জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশ পৃষ্ঠপোষকতা পেল ততটুকুই যতটা শাসকশ্রেণী তার নিজের স্বার্থরক্ষার কাজে লাগাতে পারল। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি ধর্মমতের আবির্ভাব হলো যা বিভিন্ন জাতিকে এক নৈতিকতার বন্ধনে বেঁধে বিশ্বমানবতার লক্ষ্যে এগিয়ে এল। এভাবেই সৃষ্ট হলো আধুনিক ধর্ম।

বংশ পরম্পরায় শোষন ও শাসন তখনই সম্ভব যখন মানুষের মধ্যে কোন পাপবোধ জন্মান যায় কারণ এ জন্মের দুঃখ কষ্টকে মানুষ সেই পাপমোচনের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মেনে নেয়। খ্রীষ্টধর্মে আমরা দেখলাম মনুষ্য জাতির সৃষ্টি পাপের মধ্য দিয়ে। উপনিষদীয় দর্শন বা ভারতীয় দর্শনে মানুষ অমৃতের পুত্র। তার কোন পাপবোধ নেই। পরবর্ত্তীকালে ধর্মাচরণের নামে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠা হলো। বিক্ষিপ্তভাবে ঋক্‌বেদে অনুপ্রবেশ করান হলো (অধিকাংশ পন্ডিতের মতে এই শ্লোক অর্বাচীন, বেদের সমসাময়িক নয়) ব্রাহ্মণ এক ঐশ্বরিক পুরুষের মস্তক থেকে, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈদ্য জানু থেকে এবং শূদ্র পা থেকে সৃষ্ট। এই ভাবেই জন্মসূত্রে কোন অজানা পাপের কারণে তার ইহজীবনের অদৃষ্ট নির্ধারিত হলো। সব ধর্মেই মোটামুটি এই মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্ম সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা অনেকের কাছে সরলীকরণ মনে হতে পারে কারণ অনেকেই মনে করেন ধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের উপর দাড়িয়ে আছে। মানুষের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত সুতরাং ঈশ্বরকে উপাসনা করা, তার ইচ্ছায় চালিত হওয়া ধর্মবিশ্বাসের মূল উৎস। অথচ যে তিনটি ধর্মমত, যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম তথাকথিত বিশ্বমানবতার কল্যাণে জাতি গোষ্ঠী ভাষার উর্দ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে সংশয়বাদী। আবার আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা মানুষের আত্মানুসন্ধানকে অনেকেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই মনোভাবের লোক তুলনামূলকভাবে বেশী। তার কারণ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সীমারেখা অনেক দুর্বল। সহজভাবে বলা যায় খ্রীষ্টধর্ম যেমন অ্যারিষ্টটলীয় জ্ঞানতত্ত্বকে ধরে নিয়ে তার ধর্মদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, অথচ অ্যারিষ্টটলীয় জ্ঞানতত্ত্ব সবসময়ই খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্ব থেকে আলাদা ভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ভারতীয় দর্শনে তা হয়নি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা আত্মানুসন্ধান ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু ধর্মতত্ত্ব সামাজিক। ধর্ম মূলত নীতিবোধ। সলোমন রেইনাথ এর মতে ধর্ম মানেই নিয়ন্ত্রণ। ম্যাথু আর্নল্ড এর মতে ধর্ম হলো আবেগের স্পর্শযুক্ত নৈতিকতা। কান্ট এর মতে দৈব নির্দেশে সকল কর্ম করাই হলো ধর্ম। যুক্তির উর্দ্ধে নীতিবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই প্রত্যাদেশের ধারণা আনা হয়েছে।

ধীরে ধীরে যে দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সত্যকে জানার জন্য, মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তোলার জন্য সেই শাস্ত্রকে ধর্মদর্শনের মোড়কে মানুষকে পীড়ন করবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শিখল শাসকশ্রেণী। এক দেশ অন্য দেশকে পদানত করল ধর্মবিস্তারের নামে, প্রগতির ধুয়ো তুলে লুন্ঠনের নাম দেওয়া হলো ধর্মযুদ্ধ। অবশ্য পৃথিবী তার ফলে ছোট হলো। একই ধর্মের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ একত্রিত হলো। আমরা তাকে বললাম প্রগতি। এ ছাড়াও শাসকশ্রেণী শাসিত মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম করার বিষয়েও ধর্মকে

ব্যবহার করেছে। সামাজিক শোষণের যে দুটি দিক আছে অন্য দেশকে পদানত করা এবং নিজ দেশের অধিকাংশ লোককে দাবিয়ে রাখা, তার মধ্যে প্রথমটিকে অনেক দিক থেকে প্রগতি পন্থী তথা প্রশংসনীয় কাজ বলে দাবী করা হয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যতদিন এই পরদেশীয় লুণ্ঠন চালু রাখা গেছে স্বদেশীয় মানুষ ততদিন কিছু সুবিধা ভোগ করেছে। যেই মাত্র পরদেশ লুণ্ঠনের সুযোগ বন্ধ হয়েছে, স্বদেশে শোষণের মাত্রা বেড়ে গেছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে তিনটি প্রচারমুখী ধর্ম সবচাইতে উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট আর ইসলাম, তারা কিন্তু একই রকম আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে নি। ইতিহাসে খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্ম প্রচারের যে সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেখা যায় বৌদ্ধধর্মে তা অনেক অংশেই অনুপস্থিত। জীবনের যে উদ্দেশ্যকে ঘিরে ধর্মের নীতি-বোধগুলো গড়ে ওঠে তার উপরেই নির্ভর করে সেই ধর্মমতাবলম্বীদের জীবনবোধ। আমরা যদি তিন ধর্মের জীবনবোধ নিয়ে আলোচনা করি তবেই এই বিষয় নিয়ে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারধর্মী ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম তার জ্ঞানতত্ত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। গৌতম বুদ্ধ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে গভীরভাবে অনুভব করেন এবং এই অনুভবকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তিনি এক বিশেষ উপলব্ধিতে উপনীত হন। তিনি বলেন জগৎ হলো মায়া। এই মায়ার উৎপত্তি হয় কামনা ও বাসনা থেকে। দুঃখ কষ্টের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের পথ হলো এই কামনা ও বাসনাকে দমন করা। এই মুক্তির পথ সকলের জন্য। যারাই এই শর্ত পালন করবে তারাই মুক্তিলাভ করবে। প্রাথমিক অবস্থায় কোন ধর্মান্তরের বিষয় বৌদ্ধধর্মে ছিল না। মূলত এই ধর্ম গড়ে উঠেছিল কামনা বাসনার নিবৃত্তি হেতু অষ্ট মার্গ বা এক নীতিবোধের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিকাশের ধারণায়। উপনিষদীয় দর্শনের মত বৌদ্ধ দর্শনেও জ্ঞানতত্ত্ব ও নৈতিকতাকে এক বাধনে বাঁধা হয়েছে, বলা হয়েছে, পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ধর্মান্তর না থাকায় বৌদ্ধধর্ম কখনও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে নি। পরবর্তী-কালে রাজারা যখন বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করলেন তখন বৌদ্ধ ধর্মের একটি শাখায় হীনযান মতে (যা মূলত রাজধর্ম) জ্ঞানতত্ত্বের গুরুত্ব কমে গেল এবং বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে মেনে নেওয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের সংশয়বাদী চরিত্র নষ্ট হলো। উপরন্তু মুক্তিলাভে গুরুর প্রয়োজনের কথা বলা হলো। ধর্মান্তর চালু হলো। এ সত্বেও বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিবোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবে কখনই খুব বেশী আগ্রাসী হয়ে উঠল না। ভারতীয় দর্শনচিন্তাগুলি মূলত বেদ উপনিষদের চিন্তা থেকেই তাদের উৎস খুঁজে নিয়েছে। ঋক্ বেদে সৃষ্টির সম্পর্কে বলা হয়েছে—'তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না।··· কোথা হইতে যে হইল তাহা কেই বা জানে ? এই নানান সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।' ঈশ্বর এখানে নৈর্ব্যাক্তিক, সাধারণভাবে মানুষের কাজকর্মের নিয়ন্তা হিসেবে যে রূপে দেখা যায় তা এখানে অনুপস্থিত। উপনিষদে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে বলা হয়েছে জগৎ প্রথমে বিমূর্ত ছিল পরে মূর্ত হয়েছে। উপনিষদ রচয়িতারা আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী, সুতরাং জগৎ যখন বিমূর্ত ছিল তখন অদ্বিতীয় সৎরূপেই বর্ত্তমান ছিল। সেই সৎ-স্বরূপ সংকল্প করলেন আমি বহু হই, এবং জন্ম গ্রহণ করি এবং একে একে সৃষ্টির বিকাশ হলো। উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরের পরিপূরক, সুতরাং আত্মাকে জানা এবং ঈশ্বরকে জানার মধ্যে কোন ভেদ নেই। আবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য রসাস্বাদন। সুতরাং এ দর্শনেও কোন উদ্দেশ্যকে ঘিরে আগ্রাসী চিন্তা গড়ে উঠল না। ফলে হিন্দু-ধর্ম তার গোষ্ঠী ধর্মের চরিত্র অনেকটাই বজায় রাখল। এ কারণেই সারা ভারত একই শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় এল বৃটিশ শাসনের সময়, যদিও মুসলমান সম্রাটরাই সারা ভারতব্যাপী এক রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আগে বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন হিন্দুরাজা চেষ্টা করলেও, তা কখনও পরিপূর্ণ রূপ পায় নি।

খ্রীষ্টধর্ম দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্ম। এই ধর্মে ঈশ্বরকে পৃথিবীর স্রষ্টা ভাবা হয়েছে। মানুষের জীবনের

উদ্দেশ্যও ঈশ্বর দ্বারা চালিত। যীশুর শিক্ষার আদর্শ হলো ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। এখানে আত্মোপলব্ধির দ্বারা কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্যে, জীবনের শান্তি খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে যীশু নিজেই পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি ভক্তদের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা, দয়া লাভের মধ্যস্থতা করেন। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বুদ্ধ যখন বলেন 'তুমিই তোমার আশ্রয় হও। বাইরের কোন সাহায্য বা আশ্রয় তুমি কামনা কোরো না। আলোর মত সত্যর দিকে তাকিয়ে থাক। সত্যকে আশ্রয় কর। নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা কোরো না।' সেখানে যীশু বলেন 'আমিই জগতের আলো, আমি সত্য, আমিই জীবন। আমার কাছে এসো তোমরা যারা শ্রান্ত ক্লান্তের দল, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব'। এ কারণেই যীশুর শিষ্যরা যীশুর প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকে তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলে মনে করেন। এই পার্থক্যকে হর্কাডিং তার ধর্মদর্শনের আলোচনায় বলেছেন 'এশিয়াকে বুদ্ধ শান্ত করেছেন আর যীশু ইউরোপকে বিশালতর হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।' এই ভাবেই খ্রীষ্টানরা বিশ্বজয়ের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করাকে পবিত্র কর্ত্তব্য মনে করেছেন। যার ফলে বিধর্মীদের সাথে মনুষ্যেতর জন্তুর মত ব্যবহার করা হলো। খ্রীষ্টান লেখকদের কলম থেকে আমরা জানলাম আফ্রিকানরা মানুষ খায়। জোর করে নিগ্রোদের দাস হিসেবে নিয়োজিত করা হলো। এর জন্য কোন পাপ বোধ জন্ম নিল না কারণ যীশুর প্রতি আনুগত্যর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজত্ব স্থাপন ছিল তাদের জীবনের মূল সাধনা। খ্রীষ্টধর্মীয় শাসকরা এই সুযোগকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগান।

ইসলাম ধর্মতেও আমরা একই ধরণের বিষয় দেখতে পাই। এই ধর্মে ঈশ্বরের একত্বের ও সার্বভৌমত্বের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কোন রকমের পৌত্তলিকতা বা বহু ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন শত্রুতা এই ধর্মের একটি বৈশিষ্ট। 'আল্লা ব্যাতীত কোন দেবতা নাই এবং মহম্মদ তাহার আধার' এই চিন্তায় বশবর্ত্তী হয়ে মহম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আল্লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা মুসলমান জীবনের প্রধান কাম্য হয়ে যায়, আর তা ব্যবহার করে শাসকরা। যদিচ এই ধর্মগুলিকে আমরা বিশ্বজনীন ধর্ম বলেছি কিন্তু এই ধর্মগুলিই অন্য ধর্মের লোক বা বিধর্মীকে ঘৃণা করতে শেখায়। এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম অনেক বেশী সহনশীল।

হিন্দু ধর্ম বলে পরিচিত উপনিষদীয় চিন্তায় এই বিষয়গুলি ছিল না যেহেতু আগ্রাসী চিন্তা এই দর্শনে পুষ্ট হয় নি। এ কারণে শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধ বিরোধিতা প্রভৃতি কিছু ঘটনা ছাড়া ভারতের ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধের ধারণা এসেছে মুসলমান যুগে। ভারতে আজ প্রায় হাজার বছর আগে যখন মুসলমান আক্রমণ হয় সে সময় হিন্দুরা অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের বন্ধনকে শক্ত করার চেষ্টা করে। গোষ্ঠী ধর্মের চরিত্র বজায় থাকায় হিন্দুরা কখনই একসূত্রে নিজেদের বাঁধতে পারে নি। ফলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শাসনের কাছে বাশ্যতা স্বীকার করে নেয় (কিছু ব্যাতিক্রমী অবশ্যই আছে)। হিন্দু শাসকদের সামনে রেখেই মুসলমান শাসকরা এদেশ শাসন করে এবং বলপ্রয়োগে ধর্মান্তকরণ হ্রাস পায় কারণ শাসক শ্রেণীর কাছে ধর্ম নয় রাজ্য বিস্তারই ছিল মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে মুসলমান শাসকদের কাছে নিজেদের দর বজায় রাখার জন্য দেশীয় রাজারা সাধারণ মানুষকে তার অনুগত রাখতে চায় আর এই আনুগত্য সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয় ধর্মের শক্তি। পূজারীদের অনুশাসন, জাতিভেদের কঠোরতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়ে এই প্রায় ক্লীব শাসক গোষ্ঠীর হাতে ভারতীয় সমাজ গ্লানিতে ভরে যায়। সৃষ্ট হয় এক ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ।

আধুনিক পর্ব—বিজ্ঞানের যুগ

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে এমনই এক সময় যখন ধর্মদর্শনের সংস্কারে দর্শন ব্যাধিগ্রস্ত, হারিয়ে ফেলেছে তার জ্ঞানের সাধনা। ভৌগলিক কারণে প্রচারধর্মী ধর্মগুলির বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। আগ্রাসী এবং আত্ম-

রক্ষাকারী দুজাতীয় ধর্মভাবনার মানুষই জ্ঞানের সাধনা থেকে সরে এসে ধর্মীয় কুসংস্কার আর অনাচারের শিকার হলো। তখন অনেক জ্ঞানীজন বুঝতে শুরু করলেন ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা। অ-জ্ঞানের অন্ধকার থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করতে না পারলে সমাজের উন্নতি নেই। যে ধর্ম প্রাথমিক অবস্থায় ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভাষার মানুষকে একত্রিত করেছে পরবর্তীকালে তা ভিন্ন ধর্মের মানুষকে হানাহানিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাই ধর্মীয় নৈতিকতার উর্ধে অন্য কোন নীতিবোধের সন্ধানে লিপ্ত হলেন অনেকে।

আমাদের দেশে মধ্যযুগে কবীর, রামানন্দ নামক প্রভৃতি অনেক মানুষ এগিয়ে এলেন সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এক নতুন চিন্তা নিয়ে। বঙ্গ দেশে শ্রীচৈতন্য রাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখলেন। শ্রীচৈতন্যের কাছে জ্ঞান শক্তির উৎস নয় নান্দনিক বোধ বিকাশের পন্থা। তাঁর এই চিন্তা যদিচ সমাজে এক নবজাগরণ আনল, এর প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল জ্ঞানের বিকাশ কারণ নীতিবোধ ও জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমত বিদেশী শাসনের প্রভাব এবং দ্বিতীয়ত তাঁর শিষ্যদের ব্যর্থতা এই বিকাশকে স্তব্ধ করে দিল। কারণ তাঁর শিষ্যরা এই দর্শনকে উপলব্ধি করতে পারেন নি বা হয়তো সংস্কার বশতই পুরোনো ধ্যান ধারণার রাজ্যে ফিরে গেছেন।

ইউরোপেই এই সময় ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিক্ষোভ জন্মাল। ভারতে যা হলো না ইউরোপে কিন্তু সে ঘটনা ঘটল। এক নতুন জ্ঞানমার্গ, যা তৎকালীন দর্শন চর্চার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, জন্ম নিল। এই নতুন যাত্রাপথই আধুনিক বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান তার যাত্রার শুরুতেই ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার রক্ষক চার্চ, তার পুরোহিত এবং তাদের সহযোগী শাসক এর সাথে সংঘাতে নামল। খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবনের পরমকাম্য সেই ঈশ্বরের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং পৃথিবী ঈশ্বরের রাজত্বের রানী, এই বিশ্বচরাচর সবই গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে, সে কারণেই গ্রীক দার্শনিকদের সৃষ্ট ধারণা সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে (বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে এক ধরণের সাযুজ্য থাকায়) —এই সত্যকে ধরে নিয়ে খ্রীষ্টধর্মের জ্ঞানতত্ত্বকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। গ্যালিলীও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের চার্চের বা ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলার ছিল না। তাঁরা মূলত দেখালেন অ্যারিষ্টটলের রূপকল্প ভুল, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। কিন্তু পাছে জ্ঞানতত্ত্বের এই পরিবর্তন ধর্মতত্ত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই ভয়েই চার্চের নেতৃত্বে শাসকশ্রেণী পুজারীদের সহায়তায় এগিয়ে এল জ্ঞানের বিরোধিতায়। এভাবেই দর্শন চিন্তার মূলস্রোত যা জ্ঞানতত্ত্বকে বিসর্জন দিয়ে ধর্ম দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছিল এখন হয়ে উঠল জ্ঞানের শত্রু।

দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের ও বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বের ফারাক গড়ে ওঠে এই দুই ক্ষেত্রের যুক্তি পদ্ধতির বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে। দার্শনিক যুক্তি সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই ভাষায় সেই সূক্ষ্মতা নেই যাতে দ্বিধাহীন ভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায়। সাধারণ যুক্তি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয় দর্শনে, পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা সেই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দার্শনিকরা করেন না। ফলে দার্শনিক চিন্তা তার যুক্তিপদ্ধতি প্রয়োগ কর্তা নিরপেক্ষ নয়। প্রয়োগ কর্তার জাতি, ধর্ম তার সামাজিক অবস্থান সবকিছুই প্রভাবিত করে এই যুক্তিপদ্ধতিকে। অপরদিকে বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হলো এক সার্বজনীন সত্য সন্ধানের লক্ষ্য নিয়ে। তৈরী হলো এক নতুন যুক্তি পদ্ধতি, যা গড়ে উঠল অংকশাস্ত্রকে ভিত্তি করে। পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা এই যুক্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হলো। জ্ঞানের বিকাশে এল এক নতুন মাত্রা।

সার্বজনীন সত্য সন্ধানের এই লক্ষ্য পথ বিজ্ঞানের সাধনায় এক নতুন মূল্যবোধ মানুষের সামনে নিয়ে এল। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে যেহেতু বিজ্ঞানের যুক্তি পদ্ধতি সত্য, তাই এই নতুন পথের দিশারীরা স্বপ্ন দেখলেন এক নতুন বিশ্বের যেখানে মানুষের জগৎ খন্ড খন্ড হয়ে থাকবে না জাতি, ধর্ম বা সংস্কারের ক্ষুদ্র স্বার্থে। বৈজ্ঞানিকরা উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতির বৈচিত্রময় সৌন্দর্য্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব সত্য। সেই সত্যকে জানাই তার লক্ষ্য। বিজ্ঞানের

পথ যেহেতু ব্যাক্তি নিরপেক্ষ সুতরাং নিরপেক্ষভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান। এই বিশ্বাসের জন্ম হয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথেই।

অন্যদিকে প্রাথমিক বিরোধিতা সত্বেও বিজ্ঞানের সম্ভাবনা শাসক শ্রেণী উপলব্ধি করতে পারল। কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন ও উন্নতির সাথে সাথে পৃথিবী ছোট হয়ে এল। নতুন নতুন দেশের আবিষ্কার ইউরোপীয় মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদের নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিল। একাধারে সত্যানুসন্ধানের সাধনা অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে বিশ্বজয়ের কামনা এরই সংঘাতে শুরু হলো বিজ্ঞানের আদিপর্ব।

এই ভাবেই ইউরোপের ইতিহাসে এল এক নতুন যুগ। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় অনেক নতুন সত্য মানুষের গোচরে এলো, পরিবর্ত্তন এলো মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থায়। আরও বেশী করে অবসর তৈরী হলো মানুষর জীবনে, ফলে শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এল আমূল পরিবর্ত্তন। এই সময় আমরা অনেক বড় মাপের মানুষের দেখা পেলাম যারা মানুষের কল্যাণে নতুন জীবনবোধে উদ্দীপিত। সব মানুষের সমান অধিকার এই বিশ্বাস মানুষের সামনে নিয়ে এল বিজ্ঞান। এই অধিকারবোধ থেকে জন্ম নিল সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধ। নিজ ন্যায্য অধিকার দাবীর আন্দোলনে সামিল হলো মানুষ। শাসকশ্রেণীও বসে রইল না, ধর্মীয় নেতাদের সাথে জোট বেঁধে ধর্মের কিছু কিছু সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞানীদের সাথে সমঝোতা করতে চেষ্টা করল। এবং শেষে এক ধরনের দুমুখো নীতিবোধের উদ্ভব হলো। আজ থেকে দেড়শ, দুশো বছর আগে আমরা দেখলাম ইউরোপে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক নতুন উচ্চতায় পৌছল আবার সেই সঙ্গে দেখলাম ইউরোপের শাসকরা এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশকে পদানত করছে। সীমাহীন অত্যাচারের খড়্গ নামিয়ে আনছে ঐ সব দেশের অধিবাসীদের ওপর। এবং আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যখনই সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সম্ভাবনা খুলে যায়; স্বদেশে একধরণের সুযোগ সুবিধা শাসকরা দিতে পারে, সে কারণেই আমরা দেখতে পাই সাধারণ মানুষের অধিকার অনেক বিস্তৃত হয়। অথচ তারা পদানত দেশের মানুষের অধিকার হরণ করে নির্মম ভাবে।

বিজ্ঞানে যেহেতু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অংকশাস্ত্রের যুক্তি পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয় সে কারণে প্রথাগত শিক্ষা সবসময়ই খরচা সাপেক্ষ যে কারণে শাসকশ্রেণী প্রায়শই বিজ্ঞান চর্চার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সক্ষম। বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের উন্নতি মুখ্যভাবে যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর সাথেই জড়িত। অবশ্যই জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি নানান দিকে বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না কিন্তু সেই ধারা সবসময়ই ক্ষীণ। এই ভাবে বিজ্ঞানে উন্নত দেশ বিজ্ঞানের সুফলকে পণ্যে পরিণত করে এবং অনুন্নত দেশের উপর শাসন শোষণ কায়েম করার কাজে লাগান।

বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত মানুষের দর্শনচিন্তায়ও প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম দর্শনের বিকাশের আগে যেমন আমরা ভারত, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে দর্শন শাস্ত্রের বিকাশ দেখেছিলাম, ইউরোপেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন চিন্তার বিকাশ দেখলাম। যুক্তিবাদ এই সব দার্শনিক চিন্তায় এক গভীর প্রভাব বিস্তার করল। সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার প্রভাব এড়িয়ে কিছু কিছু দার্শনিক সমাজতন্ত্র বিশ্বমানবতার বিকাশে নিজেদের নিয়োজিত করলেন। কিন্তু কোন দর্শনচিন্তা তখনই মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সেই দর্শনচিন্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নীতিবোধ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইউরোপের নবজাগরণের প্রভাবে যদিচ সমাজের অগ্রসর অংশের মানুষের মধ্যে এক নতুন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঞ্চার হলো কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নীতিবোধ সঞ্চারিত হলো না; বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণীর প্রভাব বেড়ে গেল। কিছু সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের নীতিবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

হলো সাধারণ মানুষের মনে। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল শক্তি অর্জনের এবং সেই সাথে পার্থিব সুখ লাভের পন্থা।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইজেনবার্গ কৈশোরে সঙ্গীত চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সেখান থেকে যখন বিজ্ঞান চর্চার কথা ভাবলেন তখন এক বন্ধুর মা ওঁকে বলেছিলেন 'কেন সঙ্গীত চর্চার মত সুন্দরের আরাধনা ছেড়ে পার্থিব সুখের জন্য তুমি বিজ্ঞানের চর্চা করবে? এভাবে যদি সবাই বিজ্ঞান চর্চায় যায় তবে পৃথিবী থেকে. জীবন থেকে সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে।' সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা এরকমই ছিল। হাইজেনবার্গ বিশ্বাস করতেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে চান বিজ্ঞান তার কাছে সেই অজ্ঞেয় সুন্দরের রূপকে আরও সুন্দর ভাবে প্রতিভাত করবে। তথাপি তিনি পারেন নি বন্ধুর মাকে একথা বোঝাতে, পারেন নি বিশ্বাস করাতে।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে জ্ঞানাশ্রয়ী নীতিবোধ বলতে কি বোঝায়? উপনিষদে এক দ্বিস্তর নীতিবোধের কথা বলা হয়েছে। একটি সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার আচরণবিধি যা সকলকে মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয়টি জ্ঞানমার্গীদের জন্য। উপনিষদে বলা হয়েছে 'সত্যম শিবম সুন্দরম' এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে জ্ঞানী মানুষের জীবন বোধ। এই জীবনবোধে উন্নীত হতে হলে নিজেকে স্বার্থশূন্য ভাবে সমস্ত মানুষের সাথে এক আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে হবে। কামনা বাসনার থেকে মুক্ত করতে হবে নিজেকে। আধুনিক বিজ্ঞানের এক জ্ঞানযোগী আইনষ্টাইন তার এক লেখায় বলেছেন, বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তিনি বুঝেছেন জীবনে সত্য, সৌন্দর্য এবং মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। সৌন্দর্য আর মঙ্গলময় তার মধ্যেই সত্য বিরাজ করে। আবার বিজ্ঞান চর্চা ওনাকে জীবনে এক নতুন মূল্যবোধের সামনে দাঁড় করিয়েছে যা আত্মীয় পরিজন, জাতি, ধর্ম সব থেকে সরিয়ে নিয়ে বৃহৎ মানবতার সাথে আত্মীয়তায় বেঁধেছে। তিনি আরও উপলব্ধি করেন—পার্থিব বিলাসে যারা মগ্ন তারা তো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে, পার্থিব সুখ ওঁকে একেবারেই আকৃষ্ট করে না। আমরা দেখলাম এক জ্ঞানমার্গী বিজ্ঞান সাধকের জীবনভাবনা, অবচেতন ভাবে, উপনিষদ বর্ণিত ভাবনার সাথে মিলে গেল। কিন্তু এই জীবনবোধ তিনি সঞ্চারিত করতে পারেন নি সাধারণ মানুষের মধ্যে, এমন কি তার সহকর্মী বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। আমরা দেখলাম তাঁর জীবদ্দশাতেই তারা জড়িয়ে গেলেন বিজ্ঞানের শক্তির দম্ভে। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সবর্ন একজায়গায় বলেছেন—নীতিহীন বিজ্ঞানের ভবিষ্যত দুটি হতে পারে। এক, বিজ্ঞান পারমানবিক অস্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে অথবা কিছু অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রীর হাতের পুতুল হয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কি ভাবে এই নীতিবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

বিজ্ঞানের অগ্রগতি আরও এক পরিবর্তন এনেছিল সমাজ ব্যবস্থায়। ভারতে জাতিভেদের মধ্যে যার প্রত্যক্ষ রূপ, পরোক্ষ রূপে অতীতে প্রায় সব সভ্যতাতেই শ্রমজীবি মানুষকে নীচু চোখে দেখা হতো। বিজ্ঞানের যুক্তি যেহেতু প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োগ যেমন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জীবন ধারণের পন্থায় পরিবর্তন আনল তেমনি সেই সঙ্গে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব বাড়াল। বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন অনেক মানুষও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এই সভ্যতার বিকাশে জ্ঞানীজনের বৌদ্ধিক শ্রমের সাথে সাথে শ্রমজীবি মানুষের কায়িক শ্রমও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এই চিন্তার প্রকাশ আমরা পেলাম আধুনিক কালের সবচেয়ে বেশী আলোচিত দার্শনিক কার্ল মার্ক্স এর চিন্তাধারায়। বিজ্ঞানের মত এই দর্শন চিন্তাও তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়ে গড়ে উঠল, নতুন আলোয় বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হলো সভ্যতার ইতিহাস। যেহেতু তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের সমন্বয় এই দর্শনচিন্তার মূল বৈশিষ্ট, এবং মানব সমাজে কোন চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, কোন বিশ্বাস গড়ে তুলতে, কোন নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এক নীতিবোধের প্রয়োজন; এই দর্শন তার জ্ঞানতত্ত্বের

পাশাপাশি এক নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এল। শাসকশ্রেণীর ধর্মীয় অনুশাসনের আগ্রাসী চিন্তার পাল্টা হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশ্বমানবতার আলোয় এক নতুন নীতিবোধের কথা, এই দর্শন চিন্তায় আমরা পেলাম।

এই দর্শনকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের আবির্ভাবে মানুষ মনে করল বিজ্ঞান এবার এক নতুন মূল্যবোধের সূচনা করবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টির শুরুতেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণের মুখে পড়ল। সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার নেতারা সারা পৃথিবীর জনগণের কাছে আবেদন রাখলেন যে দুনিয়ার শ্রমজীবি মানুষের দুর্গ রাশিয়াকে রক্ষা করা তাদের আশু কর্তব্য। বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারত কি না তা পরীক্ষা করার আগেই দেখা গেল আত্মরক্ষার উদ্যোগের পথ বেয়ে সেখানেও এল শক্তির আরাধনা। মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তুলনায় গুরুত্ব পেল সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্যোগ। বিজ্ঞান সেখানেও প্রতিষ্ঠা পেল শক্তির দেবতারূপে। সমাজতান্ত্রিক দর্শনও হলো ব্যাধিগ্রস্ত। ভারতের ইতিহাসে আমরা যেমন দেখেছি ধর্মদর্শনের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও আত্মরক্ষার নামে ধর্মের শক্তির আরাধনা যেমন এক ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের জন্ম দিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক দেশেও তার পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেল। আত্মকেন্দ্রিকতা কেন্দ্রমুখী, ফলে রাশিয়াকে কেন্দ্র করে যে শক্তি সঞ্চয়ের অভিযান শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়াল শাসকশ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়ের পথ। সাধনা আর কামনার মধ্যে দেখা দিল ব্যবধান। সৃষ্টি হলো এক ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ। এমনকি এই শাসকশ্রেণীর কামনায় সাম্রাজ্যবাদী রূপও প্রকট হতে শুরু করল।

ধর্মদর্শনের আওতায় আগ্রাসী চিন্তা মানুষের নৈতিকতায় এক ধরণের বিশ্বাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে ধর্মবিস্তারের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদের অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত করা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের আগ্রাসী চরিত্রের সপক্ষে তেমন কোন বিশ্বাসের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়, ফলে মানুষ নৈতিকতার এই বিচ্যুতি মেনে নিতে পারল না। সাধনা আর কামনার ভিন্নরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না। নব্যশাসকশ্রেণী সে কারণেই আনুগত্যর উপর জোর দিল এবং এভাবেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের বিশ্বজনীন আবেদন হারাল এবং ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক চিন্তার দাসত্ব স্বীকার করে নিল।

আবার আত্মকেন্দ্রিকতা কেন্দ্রমুখী বলেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেও একধরণের রেষারেষির সৃষ্টি হলো। তারই ফলশ্রুতি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষধাপে হিরোশিমায় বোমা বিস্ফোরণ বিজ্ঞানকে শক্তির দেবতা, ভয়ংকরের দেবতারূপে সাধারণ মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা দিল। সত্যি কথা বলতে, বিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করেছিল ধর্মীয় সংস্কার থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করার সাধনা নিয়ে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা না পারল নিজেদের জন্য কোন নীতিবোধ নির্ধারণ করতে, না পারল সাধারণ মানুষকে কোন নতুন নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করতে। ধর্ম কিন্তু তা পেরেছিল। ফলে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সার্বজনীন জ্ঞানের বিকাশ হলেও জাতি, ধর্ম দ্বারা খন্ডিত মানবের মূল্যবোধে কোন কাঙ্খিত পরিবর্তন এল না—বিজ্ঞান ব্যবহৃত হলো নিজ জাতি নিজ ধর্মের শক্তির বিকাশে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাথমিক বিকাশের কালে যে সাধকের ছবি পাওয়া যেত তা ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল। কিছু ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া, বিজ্ঞান হয়ে উঠল পার্থিব সুখ, আত্মসুখ অর্জনের পন্থা। জীবন হারিয়ে ফেলতে শুরু করল তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য। অন্যদিকে জ্ঞানের বিকাশ পাপপুণ্যের সাধারণ কুসংস্কার অনেকখানি শিথিল করল, যা সঠিকভাবে ব্যাবহৃত হলে মানুষের উপকারে লাগত, তা ভুল পথে চালিত হয়ে সমাজ সংসারে এক বিকৃতির জন্ম দিল। টি, এস, ইলিয়টের ভাষায় বলতে হয়,

'Whre is the life we have lost in living ?'

জীবন কোথায় যা হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন যাপনে ?

আর আমাদের মত অনুন্নত দেশে অবস্থা তো আরও করুণ। আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের সাধনার মূল দিক শক্তির আরাধনা—প্রতিরক্ষার অস্ত্রসজ্জায়। এই সব অনুন্নত দেশে মানুষকে অভুক্ত রেখে, তার শিক্ষাকে সংকুচিত করে, অস্ত্র আমদানী করতে হয় ঐ সব বিজ্ঞানে উন্নত দেশ থেকে। এদেশে বিজ্ঞান চর্চাও স্বাধীন নয়, এখানেও বিজ্ঞানে উন্নত দেশের সদম্ভ উপস্থিতি। এ অবস্থা জন্ম দিয়েছে একধরণের হীনমন্যতার। ফলে বিজ্ঞান উন্নত দেশে বাড়িয়েছে জাতীয়তাবোধ, ধর্মীয় সচেতনতা আর অনুন্নত দেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বাদেশিকতা। তাই এই সব অনুন্নত দেশে 'গভীর গভীরতর অসুখ এখন'।

এ প্রবন্ধ পাঠ করে মনে হতে পারে বিজ্ঞানের কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিজ্ঞানের ধ্বংসে মানুষের মুক্তি। তা কিন্তু নয়, কারণ বিজ্ঞান যতই ব্যাধিগ্রস্ত হোক না কেন, বিজ্ঞান সার্বজনীন জ্ঞানের প্রকাশ মাধ্যম। বিজ্ঞানের মর্মবাণীতেই নিহিত আছে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির বীজ। একমাত্র বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখলেই এই উপলব্ধিতে পৌঁছন যায় যে সব মানুষই সমান—যাই হোক না কেন তার জাতি, ধর্ম, ভাষা। আসলে ধর্মদর্শনের কঠিন চাপে একদিন যেমন বিশুদ্ধ দর্শন বা জ্ঞানের প্রসার থেমে গিয়েছিল, তেমনি বিজ্ঞান আজ বিপথগামী শক্তির আস্ফালনে। মধ্যযুগের মতই মানুষকে আবার এক মুক্তির সন্ধানে ব্রতী হয়ে উঠতে হবে। আজ মানুষকে খুঁজে বার করতে হবে সেই জীবনবোধ যে জীবনবোধ তাকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বাদ এনে দেবে, কৃত্রিম বিলাসের পথ থেকে নিয়ে যাবে এক নতুন নান্দনিক বোধের জগতে। বিজ্ঞানই খুলে দিতে পারে সেই পথ। এবং সত্যিই যদি একদিন বিজ্ঞানের ব্যাধি দূর করা সম্ভব হয় তাহলে টি. এস. ইলিয়টের সেই প্রশ্নের জবাব পেতে পারি

জীবন কোথায়? জীবনকে খুঁজে পেয়েছি বিজ্ঞানসম্মত জীবন যাপনে। □

With Best Compliments From :

DUTTA ROY & CO.

ELECTRICAL ENGINEERS & GOVT. LICENSED CONTRACTOR

15, OLD MAYOR'S COURT
CALCUTTA-700 005

Phone : 555-6213

বিষয় ঃ পরিবেশ (দ্বিতীয় পর্ব)

[দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্ধ্বে কোন বিমূর্ত বিষয় নয় পরিবেশ। মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-কৃতি সবই পরিবেশ-নির্ভর, লয়ও বোধহয় পরিবেশ ধ্বংসে। সমাজ সংস্কৃতি জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া-উপচ্ছায়া কবলিত। বিজ্ঞান-কারিগরী পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দূষণ-রোধেও বিজ্ঞান-কারিগরীকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশমুখী একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানের উদ্যোগ—'বিষয় : পরিবেশ'।

যে কেউ এ বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। কম বেশী দু'-হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। চিঠিপত্রে মতামত জানান। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর খবর, টিকা, সমীক্ষাও গৃহীত হবে। সম্পাদকমন্ডলী—'বিওবি']

দূষণের মাপ ও মাত্রা (তৃতীয় অংশ) ঃ পানীয় জল

তখন মানুষ ছিলাম—
দাবদাহের উষ্ণতায় ছিলো বর্ণচ্ছটা
হিমেল হাওয়ায় ছিলো মনচোরা গন্ধ
রোদ্দুরে লেপ্টে থাকতো সোনারূপোর কুচি
বৃষ্টি ফোঁটারা নাচতো আনন্দে
চোখের জলে ঝরতো কখনো মণি মুক্তো !

তখন মানুষ ছিলাম—
অনুভব করতাম একটা একটা করে একসঙ্গে
স্নেহ প্রেম সুখ আনন্দ
বিদ্বেষ ঘৃণা দুঃখ আর বিষাদ
দু' দু'আনা করে আমার ষোলো আনা।

চারপাশে ছিল আমারই মত অন্যরা
দু দু' আনা অনুভূতির ষোলো আনারা
আর ছিল অমলিন আকাশ
অমৃতরূপী নিষ্কলঙ্ক জল।

ওগো পৃথিবীর দ্বিপদ অধীশ্বর
আমাকে বঞ্চিত ক'রো না
মানুষই থাকতে দাও
তুমিও মানুষ থাকো !

প্রিয় সম্পাদক,
'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

এক বন্ধুর সৌজন্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর '95 সংখ্যাটি হাতে এসেছিল। জল-দূষণ বিষয়ক রচনাটি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কেননা পানীয় জলের সমস্যায় আমরাও জর্জরিত।

রচনাটি এমনিতে খুবই ভালো লেগেছে, জল-দূষণ কি কি কারণে ঘটে এবং কিভাবে দূষণ মাপা হয় সে সম্পর্কে কিছু জানতে পেরে বিশেষ উপকৃত হলাম।.....কিন্তু রচনার শুরুতে পানীয় জলের নানা সমস্যার কথা উল্লেখ থাকলেও, পরে আর তা নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাই করা হয়নি—যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসতে পারতো। রচনাটি পড়ে জ্ঞানলাভ হয় ঠিকই (এবং পরোক্ষে তা খুবই কাজের), কিন্তু বাস্তব সমস্যায় আশু কাজে লাগে না। তাই আপনার মাধ্যমে লেখকের কাছে আমার অনুরোধ—পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে কাজে লাগানোর মত কিছু যদি জানান তো খুবই ভালো হয়।.....

—হাফিজুর রহমান (করিমপুর, নদীয়া)

শ্রীযুক্ত রহমানের চিঠিটিকেই এবারের আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে উপস্থিত করে পানীয় জল সম্পর্কে দু চার কথা বলার চেষ্টা করি। তাঁর সমালোচনা সর্বাংশে সঠিক। এবং আমার প্রয়াস কতটা সফল হবে সে বিষয়ে আমার নিজেরও আশংকা কম নেই। শেষ বিচারে এ আলোচনাও হয়তো 'জ্ঞানমূলকই' হয়ে পড়বে, যথেষ্ট 'কেজো' হয়ে উঠতে পারবে কিনা জানিনা। সেজন্য আগেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। আমার আশংকার অন্যতম কারণ এই যে কোন বিশেষ সমস্যার (পানীয় জলের) সমাধানের প্রচেষ্টা সমস্যাটির নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এবং আলোচনাটা আমাকে সাধারণভাবেই করতে হবে। আপাততঃ পানীয় জলের সমস্যার প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা-বোঝা এবং সমস্যা নিরসনের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হলে সর্বপ্রথম পানীয় জলের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের (WHO) পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে পানীয় জলের গুণমান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এবং মোটামুটি তারই ভিত্তিতে ভারতীয় মানক সংস্থা (Indian Bureau of Standards) জাতীয় স্তরে পানীয় জলের গুণমান নির্দেশ করেছেন (Indian Standard No. 10500/1983, First Revision 1991)। সেটিকে সামনে রেখেই আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

পানীয় জলের গুণমান (1)

বৈশিষ্ট্য/উপাদান	গ্রহণীয় সর্বোচ্চ মাত্রা (2)
অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য (Essential Characteristics)	
বর্ণ, অস্বচ্ছতা	বর্ণহীন, স্বচ্ছ (3)
স্বাদ, গন্ধ	বিজাতীয় স্বাদ ও গন্ধমুক্ত (3)
পি এইচ (pH)	সর্বনিম্ন 6·5 সর্বোচ্চ 8·5
মোট খরতা (hardness, $CaCO_3$ হিসেবে)	600 পি পি এম (বা 600 mg প্রতি লিটারে)
লোহা (মৌল Fe হিসেবে)	1·0 পি পি এম
ক্লোরাইড (Cl হিঃ)	1000 পি পি এম (4)
মোট কলিফর্ম (টোটাল কাউন্ট বা TC)	প্রতি 100 মিলিমিটারে 10 (5)

কাম্য বৈশিষ্ট্য (Desirable Characteristics)

মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ	2000 পি পি এম
ক্যালসিয়াম (Ca হিঃ)	200 „
ম্যাগনেসিয়াম (Mg হিঃ)	30 „
জিঙ্ক (Zn হিঃ)	15 „
কপার (Cu হিঃ)	1·5 „
ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিঃ)	0·3 „
অ্যালুমিনিয়াম (Al হিঃ)	0·2 „
ক্রোমিয়াম (Cr হিঃ)	0·05 „
সীসা (Pb হিঃ)	0·05 „
আর্সেনিক (As হিঃ)	0·05 „
ক্যাডমিয়াম (Cd হিঃ)	0·01 „
পারদ (Hg হিঃ)	0·001 „
সালফেট (SO_4 হিঃ)	400 „
নাইট্রেট (NO_3 হিঃ)	45 „
ফ্লোরাইড (F হিঃ)	1 0 „
সায়ানাইড (CN হিঃ)	0·05 „
খনিজ তেল	0 03 „
ফেনল জাতীয় যৌগ (ফেনল হিঃ)	0·002 „

দ্রঃ (1) তালিকাটি কিছুটা সংক্ষেপিত এবং সামান্য সরলীকৃত। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ বলে তেজস্ক্রিয়তা, কীটনাশক এবং আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য / উপাদান এখানে উল্লেখ করা হয় নি।
পরিমাপের পদ্ধতি, একক ইত্যাদির মোটামুটি ধারণার জন্য বি ও বি জুলাই-সেপ্টেঃ '95 দ্রঃ

(2) কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুরকম উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট আছে। একটি হল কাম্য উর্ধ্বসীমা। অপরটি হ'ল বিকল্প জলের উৎস অমিল হলে যে উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত জল পানীয় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ খানিকটা ছাড়। ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রেট ও ফ্লোরাইড বাদে অন্য সব ক্ষেত্রে এখানে দ্বিতীয় উর্ধ্বসীমাটিই নেওয়া হয়েছে। আর্সেনিক, কপার, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সীসা, পারদ ও সায়ানাইডের বেলায় একটিই উর্ধ্বসীমা। কোন ছাড় নেই।

(3) বর্ণ ও অস্বচ্ছতা পরিমাপের বিশেষ পদ্ধতি ও মান আছে। কিন্তু সেই সাংখ্যিক মান সাধারণের জন্য খুব একটা প্রয়োজন নেই। তবে মনে রাখা উচিত যে অস্বচ্ছতা, রং, বিজাতীয় স্বাদ এবং গন্ধ আসলে কোনো না কোনো দূষকের উপস্থিতি নির্দেশ করে। যেমন কপার বা ক্রোমিয়ামের দ্রবীভূত লবণ জলকে রঙীন করে তুলতে পারে ; জৈব দূষণের ফলেও রং বা গন্ধ হতে পারে, ইত্যাদি।

(4) দ্রবীভূত লবণ হিসেবে ক্লোরাইড ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন, ক্লোরিন দ্বারা শোধিত জলে, কিছু অবশিষ্ট মুক্ত ক্লোরিন থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য মুক্ত ক্লোরিনের সর্বনিম্ন পরিমাণ 0·5 mg প্রতি লিটারে

(অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে 0·2 mg প্রতি লিটারে)। আবন্টিত জলে ব্যবহারিক প্রান্তে এই ক্লোরিন থাকা উচিত।

(5) আদর্শ পানীয় জলে মোট কলিফর্ম সংখ্যা (TC) প্রতি 100 মিলিলিটারে শূণ্য (O) হওয়াই কাম্য। কিন্তু বাস্তবে তা নাও হতে পারে। হঠাৎ একটি জলের নমুনায় TC প্রতি 100 মিলিলিটারে 10 পর্যন্ত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পর পর দুটি জলের নমুনায় যদি TC পাওয়া যায় (10 এর কম বা বেশী) তবে শোধন না করে সে জল পানীয় হিসেবে বর্জনীয়।

(6) খনিজ তেল, ফেনল ইত্যাদি ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু কিছু ক্ষতিকারক যৌগ তৈরী করতে পারে। সেজন্য ক্লোরিনকে পানীয় জলের শোধক হিসেবে ব্যবহারকে ঘিরে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু রোগ-জীবাণু অকেজো করার ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে বলা যায় জলে ক্লোরিন প্রয়োগে অপকারের চেয়ে উপকারের সম্ভাবনাই ভারী। বিশেষত আমাদের মত ট্রপিক্যাল জলবায়ুর দেশে। জলে অল্প স্বল্প ক্লোরিনের গন্ধ তাই উপেক্ষণীয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল কোথায় এবং কিভাবে পানীয় জল পরীক্ষা করানো যায়। সারণীতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলি কিভাবে দেখতে / মাপতে হবে সে সম্পর্কেও ভারতীয় মানক সংস্থা নিয়মবিধি ও পদ্ধতি নির্দেশিত করেছেন (প্রধানত IS Nos. 3025, 1622)*। বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে বা এমনকি সাধারণ কোন ল্যাবরেটারির পক্ষে হঠাৎ করে জলের গুণাগুণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিলে কলেজ বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন কি স্কুল বা সায়েন্স ক্লাবও নিয়মিতভাবে নিজেদের পানীয় জলের ন্যূনতম (অত্যাবশ্যক) গুণমান ঠিক আছে কিনা তা দেখে নিতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে, সন্দেহ দেখা দিলে (যেমন আর্সেনিক, সীসা, রোগজীবাণু ইত্যাদি) উপযুক্ত সংস্থা / ল্যাবরেটারী থেকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াই ভালো।

কলকাতা ও তার কাছাকাছি পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করবার বেশ কিছু ল্যাবরেটারী আছে। (এদের অনেকে দূষিত তথা বর্জ্য জলেরও পরীক্ষা করেন)। এগুলি সরকারী বা আধাসরকারী বা বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন (কয়েকটির হদিস দেওয়া গেল)।

সরকারী ও আধাসরকারী ল্যাবরেটারীগুলির অধিকাংশই সাধারণ কোন ব্যক্তিমানুষের জলের নমুনা পরীক্ষা করেন না, এমনকি ফি দিয়েও না ; উপযুক্ত কোন সরকারী সংস্থা বা পদাধিকারীর সুপারিশ দরকার।

বেসরকারী ল্যাবরেটারীগুলো থেকে উপযুক্ত ফি দিয়ে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাই—অন্তত কাগজে কলমে—জলের নমুনা পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট পেতে পারেন। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে অনেকসময়ই এরাও জল পরীক্ষা করে দিতে চান না—বিশেষত যারা সরকারী কোন দপ্তর বা বিভাগের অনুমোদনপ্রাপ্ত (যেমন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ)। আসলে রুটি রুজি তথা নিয়মিত কাজের জন্য এদের নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন শিল্প সংস্থা এবং / অথবা সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের উপর।

কাজেই এরা সদা সতর্ক—একটু বরং বেশীমাত্রাতেই—পাছে তাদের রিপোর্ট কোন শিল্পসংস্থা বিরোধী বা সরকার বিরোধী আন্দোলনে মদত দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অনুমোদিত বা সরকারী ল্যাবরেটারী ছাড়া অন্য কোন জায়গার পরীক্ষা-রিপোর্ট সাধারণভাবে আইনগ্রাহ্য নয়।

---

* ভাঃ মানক সংস্থার প্রকাশনাগুলির প্রাপ্তিস্থান : সেলস অফিস, 5 চৌরঙ্গী অ্যাপ্রোচ, পোঃ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা-72 (স্টেটসম্যান হাউস-এর কাছে)

পানীয় জলের গুনাগুণ পরীক্ষা করেন যারা

নাম ঠিকানা	মন্তব্য
সরকারী	
1. অল ইন্ডিয়া ইনষ্টিঃ অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ 110, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কল-73	সরকারী বা অনুমোদিত সংস্থার সুপারিশক্রমে ; —ফি প্রদেয়।
2. স্টেট পাবলিক হেল্‌থ্‌ ল্যাবরেটরী 2, কনভেন্ট লেন, কল-14	রাজ্য সরকারী কাজের জন্য। প্রয়োজনে মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত এই ল্যাব-এর সহায়তা পেতে পারে।
3. অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবরেটারী (ফুড এন্ড ওয়াটার) কলকাতা কর্পোরেশন 1, হগ স্ট্রীট, কল-13	মূলত, কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় নিজেদের সরবরাহকৃত জলের জন্য।
4. ন্যাশনাল টেস্ট হাউস, জেনারেল কেমিক্যাল সেকশন 11/1 জাজেস কোর্ট রোড, কল-27	সকলের জন্য, ফি প্রদেয়।
5. স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেট সেচ ভবন (চতুর্থ তল), বিধাননগর, কল-91	সকলের জন্য, ফি প্রদেয় ; জীবাণু পরীক্ষা হয় না। আর্সেনিক করা হয়।
আধা সরকারী	
1. স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কল-32	পানীয় জলের জন্য বিশেষ পরীক্ষা (যেমন আর্সেনিক) পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটির সুপারিশে।
2. এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস সেকশন বসু বিজ্ঞান মন্দির, P 1/12 CIT স্কীম VII-M, কল-54	শুধুমাত্র সুপারিশকৃত জলের পরীক্ষা করা হয়। ফি প্রদেয়।
বেসরকারী	
1. সেন্টার ফর স্টাডি অফ ম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট CK-II, সল্ট লেক, কল-91	ক) প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য / উপাদানের জন্য পৃথক পৃথক ফি নির্দিষ্ট আছে। আবার একগুচ্ছ পরীক্ষার প্যাকেজের জন্যও ফি ধার্য আছে। ল্যাবরেটারী ভেদে ফি'র পরিমাণ বিভিন্ন। মোটামুটি বলা যায় একক পরীক্ষার ফি 50-200 টাকা, সামগ্রিক পরীক্ষার জন্য 1000-4000 টাকা, বাড়তি দক্ষিণার বিনিময়ে
2. সুপারিনটেনডেন্স কোং অফ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ এভারেস্ট হাউস (7th ফ্লোর), 46C চৌরঙ্গী রোড, কল-71	
৫. এস্ক্যাপস্‌ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ 30 জওহরলাল নেহরু রোড, কল-16	
4. ইটাল্যাব (প্রাঃ) লিঃ 10, লালবাজার স্ট্রীট, কল-1	

5. ব্রিগস্ অ্যানালিটিক্যাল
AA 285, সল্টলেক, কল-64

6. এন. ডি. ইন্টারন্যাশনাল
সর্বমঙ্গলা হাউস, 5, ক্লাইভ রো (2nd ফ্লোর), রুম নং 47, কল-1

6. এনভায়রোচেক
21 S বি. কে. পাল লেন, কল-30

8. পলিউশন এন্ড প্রোজেক্ট
P 145 বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক A, কল-55

9. পি. ডি. অ্যান্ড এ. সি. রিসার্চ ল্যাবঃ
92/3 আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কল-9

জলের নমুনা নিজেরা সংগ্রহ করে নেন, কলকাতার কাছাকাছি হলে।

খ) আরও ল্যাবরেটারী আছে। সেগুলি যেমন খারাপ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে না এমন নয়, তেমনি তালিকার ক্রমিক সংখ্যাও কোন তাৎপর্য বহন করছে না।

পানীয় জল সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে তা পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিতভাবে ত্রুটি জানা এবং সে অনুযায়ী শোধনের ব্যবস্থা নেওয়া সময়সাপেক্ষ তো বটেই, ব্যক্তি মানুষের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও। এমন কি জলের বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্তত স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে বা নিতান্ত সাবধানতা হিসেবে নিম্নোক্ত পন্থাগুলির মধ্য থেকে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে :

1. ফুটে ওঠার পর অন্তত দশ মিনিট ফুটন্ত অবস্থায় রেখে ঠান্ডা করে উপরের পরিস্কার জল সাবধানে ঢেলে বা ছেঁকে অথবা সাইফন করে নিয়ে পানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

2. জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে (যেমন বর্ষা / বন্যার সময়) 'জিওলিন' ব্যবহার করা যেতে পারে।

3. বাজারে চালু নানা ধরণের ফিল্টার কিছু না কিছু উপকার করেই।

4. 10 লিটার জলে (মাঝারি এক বালতি) 4-5 মিলিলিটার (চা চামচের এক চামচ) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের 0·1 শতাংশ দ্রবণ মিশিয়ে নেড়ে দিতে হবে। ঢাকা অবস্থায় 4-6 ঘন্টা রাখার পর 2-3 গ্রাম ফটকিরি অল্প পরিমাণ জলে গুলে বালতিতে ফেলে আবার ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। এক রাত্রি (10-12 ঘন্টা) রেখে দেবার পর উপর থেকে পরিস্কার জল ঢেলে বা ছেঁকে বা সাইফন করে নিয়ে পানের জন্য ব্যবহার করা যায়।

আরো ভালো হয় যদি এইভাবে পাওয়া জলকে 6-8 ইঞ্চি পুরু একটি পরিস্কার বালু-নুড়ির স্তরের মধ্য দিয়ে চালনা করে ফোঁটায় ফোঁটায় পরিশ্রুত জল হিসেবে সংগ্রহ করে নেওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ * এক লিটার পাতিত বা ফুটিয়ে ঠান্ডা করা পরিস্কার জলে এক গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবীভূত করলে 0.1 শতাংশ দ্রবণ পাওয়া যাবে।

* গুঁড়ো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট একটা পরিস্কার কাপ বা কাচের গ্লাসে নিয়ে অল্প অল্প করে বারে বারে জল দিয়ে নেড়ে উপর থেকে বেগুনী রং-এর পরিস্কার দ্রবণকে বড় বোতলে (বাদামী রং-এর) সংগ্রহ করতে হবে। যতক্ষণ না সবটা পারম্যাঙ্গানেট গুলে যায়। শেষে অদ্রাব্য কিছু পড়ে থাকলে ফেলে দিতে হবে। এরপর বোতলে প্রয়োজন মত জল ঢেলে নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণ (1 লিঃ বা 500 মিলি লিঃ) পাওয়া যাবে। ছিপি আটকে অন্ধকারে সংরক্ষণ করলে এই দ্রবণ অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা যাবে।

* ছোট নতুন দশ পয়সার মুদ্রার ওজন ঠিক 2 গ্রাম। 20 ফোঁটায় এক মিলিলিটার ধরা যায়।

* মাটির কলসি বা জালায় পরিস্কার নুড়ি পাথরের 2-3 ইঞ্চি পুরু একটি স্তরের উপর পরিস্কার মোটা দানা-বালির আর একটি স্তর (2-3 ইঞ্চি) এবং সবশেষে সরু দানা বালির স্তর (দেড়-দুই ইঞ্চি) চাপিয়ে ফিল্টার বেড তৈরী করা যায়। নুড়ি বালির বেডের উপর গুঁড়ো কাঠ কয়লার ব্যবহার অবশ্যই আরো ভালো হবে। পাত্রের নীচে ছোট সরু ফুটো করে নাইলন বা অন্য কোন শক্ত অদ্রাব্য সুতো বা আঁশ ব্যবহার করে পরিশ্রুত জলের ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় (মিনিটে প্রায় 200 ফোঁটা)।
বালি ও নুড়ি পাথরকে গরম ও ঠাণ্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা উচিত। মাস তিনেক পর পর বালি ও নুড়ি পাথর পরিস্কার করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া দরকার।

* পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ফটকিরির পরিমাণ জলের উৎস তথা চরিত্র ভেদে কমবেশী হতে পারে। প্রয়োজনে উল্লিখিত পরিমাণের এদিক ওদিক অল্প পরিবর্তন করে দেখা যেতে পারে। উল্লিখিত পরিমাণ-গুলি বেশী ঘোলা বা দূষিত জলের জন্য নয়।

সবশেষে, বহুকথিত কথাই আবার বলতে হয়। ভারতের মানুষের রোগভোগের একটি অংশের মূলে রয়েছে পানীয় জলের দূষণ। একটু সচেতনতা ও অল্প খরচে পানীয় জলের উৎসে রোগ প্রতিরোধ অনেকটাই করা যায়; এড়ানো যায় চিকিৎসার বিরাট খরচ ও রোগ যন্ত্রণা। স্বাস্থ্য শিক্ষা পানীয় জল পরিবেশ ইত্যাদির ঘোষিত দিবস বর্ষ দশকাদি পার হয়ে আজও গ্রীষ্মে-বর্ষায় লাখে লাখে মানুষ 'আন্ত্রিক' কবলিত হয়। সরকারী ব্যবস্থা অপ্রতুল, যেটুকু আছে তারও সঠিক যথাযথ ও জনকল্যাণমুখী ব্যবহার হয় না।

পানীয় জলের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ তথা ভোটাররা যদি একটু সচেতন ও উৎসাহী হয়ে নিজেরা কিছু উদ্যোগ নেন এবং পাশাপাশি সরকারী অফিসার কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে একটু জোরালো আবদার জানান যে মাঝে মাঝে এলাকার পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, সকলকে তা জানাবার বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজনে আগাম কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে—তবে, মনে হয়, আরো বেশী ও কার্যকরী জনসেবার সুযোগ পেয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে কৃতার্থ বোধ করবেন।

□ রবীন মজুমদার

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার 1995 সালের চারটি সংখ্যা একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য: 20 টাকা ডাক খরচ সহ) 1996 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

□ গ্রাহক চাঁদা: ব্যক্তি—বার্ষিক 16 টাকা (ডাক যোগে 20 টাকা)
□ বিশেষ ক্ষেত্রে 10 টাকা (ডাক যোগে 14 টাকা)
□ প্রতিষ্ঠান: বার্ষিক 50 টাকা (ডাক খরচ সহ)

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাংক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

□ পুরনো বি ও বি-র সংখ্যার জন্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

বামফ্রন্টের শিল্পনীতি

বিবর্তন সাতাত্তর থেকে ছিয়ানব্বইয়ে

এই রাজ্যের জন্য একটি শিল্পনীতি তৈরী করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। সাতাত্তর সালে।—ক্ষমতায় এসেই। কতগুলি লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল। কিভাবে তা কার্যকর করা হবে ছিল না সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কর্মসূচী। না থাকাই স্বাভাবিক। সবে ক্ষমতায় এসেছেন। ফলে ভাবাবেগটাই ছিল বড়—সে সময়।

তারপর প্রায় উনিশ বছর কাল অতিক্রান্ত। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আজও আসীন সেই বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু রাজ্যের শিল্পচিত্র অপরিবর্তিত। বরং করুণতর এখন। সেই ভাবাবেগ আর নেই। নেই স্রোতের বিরুদ্ধে চলার প্রত্যয় বা শক্তি। তাই সাতাত্তরের শিল্পনীতি এখন স্মৃতিমাত্র। পরিবর্তিত 'পরিস্থিতি'তে শিল্পায়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষিত হয়েছে। —চুরানব্বই সালে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি বিভাগের এক আলোচনা সভায় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী কবুল করেছেন একটি কথা। চলতি একটা ভুল শুধরে দিয়ে বলেছেন যে, কোন একটি রাজ্যের আলাদা করে শিল্পনীতি থাকতে পারে না! শিল্পনীতি ঘোষণার মালিক ভারত সরকার !!

তবে কি ধরে নেব সাতাত্তর সালে ঘোষিত বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প-নীতিটি নিছক কল্পনামাত্র? ধরে নেওয়া গেল তাই। তাহলেও এর মধ্য দিয়ে তাদের তখনকার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ পেয়েছিল। চুরানব্বই সালে ফের একবার ঘোষণা করলেন তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী। এবারে এটা হল শিল্পায়নের দৃষ্টিভঙ্গী। আগের থেকে অনেকটাই আলাদা। বলা হয়েছে শিল্পায়নের স্বার্থে এই পরিবর্তন।—কোথায় কতটুকু পরিবর্তন?—দেখা যাক সংক্ষেপে।

শিল্পনীতিঃ সাতাত্তর

সাতাত্তরের শিল্পনীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী এই শিল্পনীতি। বলা হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য হবে. (ক) শিল্পক্ষেত্রে বর্তমানের বন্ধ্যা অবস্থার অবসান করা, (খ) শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান বেকারীর গতিরোধ করা, (গ) ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে উৎসাহ দেওয়া, (ঘ) রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুজাতিক ও একচেটিয়া কারবারীদের প্রভাব খর্ব করা, (ঙ) দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার ও স্বনির্ভরতায় উৎসাহ দেওয়া, (চ) শিল্পে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং (ছ) উৎ-পাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা জোরদার করা।

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল যে এই লক্ষ্যগুলি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে এই লক্ষ্যগুলি ক্রমে রাজ্যস্তর ছাপিয়ে জাতীয়স্তরে বিস্তৃত হবে।

অতীত পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা দেখেছিলেন যে স্বাধিনতার পর থেকে বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশের বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী এই রাজ্য থেকে যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে তার বেশীর ভাগটাই তারা হয় নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করেছে নতুবা অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিনিয়োগ

করেছে। খুব অল্প অংশই এই রাজ্যে শিল্পস্থাপনে ব্যায়িত হয়েছে। যতটুকু হয়েছে তাও এমন এমন ক্ষেত্রে সেখানে কর্মসংস্থান বাড়েনি খুব একটা। অন্য দিকে এরা বাজারের গতিপ্রকৃতি বুঝে এ রাজ্যের পাট কাপড় ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি শিল্পে পুরনো যন্ত্রপাতি এবং বাতিল প্রযুক্তির সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতায় পিছু হঠছে এ রাজ্যের শিল্প।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল যে বহুজাতিক সংস্থাদের নতুন করে এ রাজ্যে ঢুকতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে পুরনো যেসব সংস্থা আগে থেকে আছে তাদের কাজ কারবারে বাধা দেওয়া হবে না। অন্তত যতদিন না দেশের আইনকানুন বদলাচ্ছে।

আরও বলা হয়েছিল যে নতুন প্রকল্প বিবেচনার সময় দেখা হবে যাতে যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং যথাসম্ভব স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এও দেখা হবে যে ছোট ও মাঝারি শিল্পে উৎসাহ দিয়ে যা করা যায়, সেসব ক্ষেত্রে বড় শিল্পগোষ্ঠীদের যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়।

সংক্ষেপে এই ছিল তাদের ঘোষিত শিল্পনীতি।—তথা শিল্প সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী। এরপর প্রায় ঊনিশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে এ রাজ্যে রুগ্ন এবং বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নতুন কলকারখানা গড়ে উঠেছে সামান্যই। এই অবস্থা মোকাবেলায় কোন পরিকল্পনাই নেওয়া হয়নি এতকাল। হাজার হাজার কলকারখানার রুগ্ন বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে এবং তা প্রতিরোধে কোনরকম আন্তরিক প্রয়াস দেখা যায়নি কখনো। ফলে রাজ্যের শিল্পব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত আজ।

শিল্পায়ন দৃষ্টিভঙ্গী : চুরানব্বই

ইতিমধ্যে একসময় 'নয়া অর্থনীতি'র ধুয়ো তোলে ভারত সরকার। যার মূল উদ্দেশ্য হল শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা। দেশের বাজার বিদেশী ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলে দেওয়া। এই কর্মসূচীর সপক্ষে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাতারাতি উন্নত হওয়ার স্বপ্ন বিলোতে থাকে নানান প্রচার মাধ্যম। ইতিমধ্যে ঝকঝকে বিদেশী বিলাসদ্রব্য উঁকি দিতে শুরু করে দোকানে বাজারে। বিদেশী শিল্পগোষ্ঠী এবং অর্থলগ্নী সংস্থাদের পাকড়াও করার প্রতিযোগিতা শুরু হয় রাজ্যে রাজ্যে। এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও চুপ করে বসে থাকেনি। লুফে নিয়েছে এই সুযোগ। বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এ রাজ্যে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করতে ও শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগ করতে। এজন্য নানান সুযোগ সুবিধের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে—দেওয়া হচ্ছে মুনাফার গ্যারান্টী।

এজন্যই নতুন করে শিল্পায়নের দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করতে হয়েছে তাদের। সমঝোতা করতে হয়েছে নীতির সাথে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির থেকে বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা করে চেনা কষ্টকর এখন। তাদের শিল্পায়নের নতুন 'দৃষ্টিভঙ্গী' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, (ক) যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে অথবা পরস্পরের পক্ষে লাভজনক ক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তিকে (বলাই বাহুল্য বিদেশী সংস্থাদের) স্বাগত জানানো যেতে পারে, (খ) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানানো যেতে পারে, (গ) গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সম্পদ সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি যৌথ ও সহায়ক উদ্যোগে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে, (ঘ) শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রকল্পে যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি পুরোপুরি বেসরকারী উদ্যোগকেও জায়গা দেওয়া যেতে পারে।

লক্ষ্য করার বিষয় সাতাত্তরের শিল্পনীতিতে বিদেশী ও একচেটিয়া কারবারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল এদেরকে নতুন করে এরাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না।—নিশ্চয়ই তার কিছু কারণ ছিল। কিন্তু শিল্পায়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই আপত্তি উঠে গেল। আর বাধা দেওয়া নয়, আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হবে তাদের। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসতে শুরু করেছে বিদেশী সংস্থা। সাতাত্তরের শিল্পনীতিতে সরকারী

উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে প্রতিশ্রুতি থেকেও পেছিয়ে এসেছে সরকার। সরকারী সংস্থাকে বেসরকারী হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ

সরকারী সংস্থা লাভজনক হচ্ছে না। ফলে তাকে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত। এমন একটা ধারণা চালু আছে।—অর্থাৎ যেন অলাভজনক সংস্থা বেসরকারী হাতে তুলে দিলেই সমস্যা মিটে গেল। এরপর লাভ হতে শুরু করবে সেখানে। সত্যিই কি তাই? প্রকৃত অলাভজনক সংস্থা কেউ আগ বাড়িয়ে কাঁধে তুলে নিতে আসে?—বোধহয় না। যদিও বা আসে, তার উদ্দেশ্য কখনই সে কারখানা নতুন করে চালানো নয়, অন্যভাবে ফয়দা লোটা।

আসলে লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা অল্পআয়াসে লাভজনক করে তোলা যায় তেমন সংস্থাই হাত বাড়িয়ে নিতে এগিয়ে আসে বেসরকারী মালিক। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইলেকট্রনিক্স ডেপেলমেন্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ইউনিটের মধ্যে যেগুলির অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল সেগুলোকেই সরকার প্রথমে ব্যক্তি মালিকানার সাথে যৌথভাবে চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন, ওয়েবেল কার্বন এন্ড মেটাল ফিল্ম রেজিস্টার, ওয়েবেল সেন ক্যাপাসিটর, ওয়েবেল নিক্কো ইলেকট্রনিক্স, ওয়েবেল কমিউনিকেশনস, ওয়েবেল ইলেকট্রো-সিরামিক্স, ইত্যাদি। এর পরের পর্বে যৌথ উদ্যোগে লাভ করছে এমন কয়েকটি সংস্থাকে পুরো-পুরি বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। যেমন, ওয়েবেল টেলিম্যাটিক্স, ওয়েবেল ইলেকট্রো-সিরামিক্স। অন্যদিকে ওয়েবেল-নিক্কোর পুরো পরিচালনভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নিক্কো গ্রুপের ম্যানেজ-মেন্টর হাতে। ওয়েবেল ভিডিও সংস্থাটি বেচে দেওয়া হয়েছে ফিলিপ্স এর কাছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি মাছ-চাষ প্রকল্প মোটামুটি লাভজনক ছিল। এর মধ্যে সুন্দরবনে জেগে ওঠা চরে মীনদ্বীপ চিংড়ি-চাষ প্রকল্পটি ছিল খুবই সম্ভাবনাময়। কিন্তু এটিকে একটি জাপানী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটো গ্যাস টারবাইন ছিল কসবায়। এই টারবাইন দুটো দিয়ে দেওয়া হয়েছে সি ই এস সি'র হাতে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে লাভ হচ্ছিল না গেল দু-এক বছর। তাও সরকারী দপ্তরগুলোর অন্যায় সুযোগ-সুবিধে নেওয়ার জন্যই। লোকসানের অজু-হাতে সেই হোটেলটিকে একটি ফরাসী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কর্মীদের প্রতিরোধ আন্দোলনে তা সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত।

অর্থাৎ সরকারী সংস্থায় লাভ হচ্ছে না। তাই তাকে বেসরকারীর হাতে তুলে দেওয়াই ভাল। এমনটাই বলা হচ্ছে। সবাই জানে সরকারী সংস্থায় লাভ কিছু কম হতেই পারে। তার কারণ আছে। কিন্তু এইসব সংস্থা এক নাগাড়ে শুধু লোকসানই কেন করে? এর কারণ বোঝা কি খুব শক্ত? রাজনৈতিক আশ্রয়পুষ্ট অদক্ষ লোকেদের এইসব সংস্থার মাথায় বসালে এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।—কে না জানে? ওপরতলার অদক্ষতা সংস্থার গোটা দেহকে পঙ্গু করে ফেলে।—ঠিক এটাই হচ্ছে একের পর এক সংস্থায়।

অন্যদিকে বেসরকারী সংস্থায় কেন লোকসান চোখে পড়ে না সেটাও তলিয়ে দেখা দরকার। প্রথমতঃ বেসরকারী সংস্থা কতটুকু বেসরকারী অর্থে চলে? তাদের ষাট থেকে সত্তর শতাংশ অর্থই তো আসে ব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য অর্থলগ্নী সংস্থার কাছ থেকে। তাদের লাভের মধ্যেকার নানান কারচুপির হিসেবটাও খতিয়ে দেখা দরকার। বছর বছর বিপুল অঙ্কের টাকা কর ফাঁকি দেওয়া অথবা ছাড় নেওয়া, সাধারণ শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া, অর্থলগ্নী সংস্থার টাকা বাঁকা পথে মেরে দেওয়া অথবা দীর্ঘদিন বকেয়া রাখা। শেয়ার বাজারে নানান কারচুপি করে সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করা, সরকারের কাছ থেকে নানান সুবিধে নেওয়া ইত্যাদি। তবুও বলা হবে বেসরকারী সংস্থা লাভজনক! বেসরকারী সংস্থার লাভের হদিস পেতে আরেকটি হিসেব মিলিয়ে দেখা দরকার। দেখা দরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শত শত কোটি টাকা লোক-

সানের হিসেবটা। ব্যাঙ্কের শত শত কোটি টাকার ঋণ সবটাই নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ নেন না। আর সব থেকে বড় প্রশ্ন হল বেসরকারী সংস্থা কি অলাভজনক হয়ে পড়ছে না? বস্তুত পক্ষে বেসরকারী সংস্থাই তো রুগ্ন হচ্ছে সব থেকে বেশী।

দেশী-বিদেশী সংস্থার আবির্ভাব

শোনা যাচ্ছে বহু বিদেশী কোম্পানী এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই মর্মে বহু সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিছু কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে। তার মধ্যে একটি হল বিদ্যুৎ শিল্প। বস্তুতপক্ষে বিদ্যুৎ শিল্পে কোন বেসরকারী সংস্থাকেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি এতদিন। এদেশে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোটাই সরকারী সংস্থার হাতে ছিল। সেই প্রথা উঠে গেল। গোটা দেশেই। নানান দেশের কোম্পানী এবার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে। এবং বিদ্যুৎ বেচবে। পশ্চিমবঙ্গেও তৈরী হবে তেমন গুটিকয়েক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সি এস এস জেনারেশন মুর্শিদাবাদ জেলায় তৈরী করবে দুহাজার মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় তিনশ মিলিয়ন ডলার। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চতুর্থ এবং পঞ্চম ইউনিট স্থাপনের বরাদ পেয়েছে আরেকটি মার্কিন সংস্থা। চার'শ কুড়ি মেগাওয়াটের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য তারা বিনিয়োগ করবে একশ পনের মিলিয়ন ডলার। বাকি তিনটি ইউনিট গড়বে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ-উন্নয়ন নিগম এবং একটি জাপানী সংস্থা যৌথভাবে। পনেরো'শ মেগাওয়াটের বলাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের হাত থেকে নিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে আর পিজি-র বলাগড় পাওয়ার কোম্পানীর হাতে।

বিদ্যুৎ শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি দিক। উৎপাদিত বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিতে হয় বহু দূরদূরান্তে। শহরে গ্রামে গঞ্জে কলকারখানায় খনিতে। বিদ্যুতের এই বন্টন পর্বে বেশ খানিক শক্তি অপচয় হয়। তাই লোকসানের বোঝা বইতে হয় বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাকেই। উৎপাদন এবং বন্টন একই সংস্থার অধীনে হলে দুইয়ে মিলে লাভ ক্ষতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় বেসরকারী সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। উৎপন্ন বিদ্যুৎ বেচে দেবে বিদ্যুৎ পর্ষদকে। বন্টনের দায়িত্ব তাদের। ফলে লোকসান যা হবে সরকারী বিদ্যুৎ পর্ষদের। বেসরকারী কোম্পানীর মুনাফা 'গ্যারান্টীড'। পাওনা কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেবে সরকারী সংস্থার কাছ থেকে। কারণ সরকার যে হারেই বিদ্যুৎ বেচুক না কেন এই বেসরকারী দেশী-বিদেশী কোম্পানী বিদ্যুতের মূল্য ধার্য্য করবে তাদের নিয়োজিত মূলধনের হিসেব ধরে। যেমন মহারাষ্ট্রের দাবোল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এনরন সংস্থা শর্ত দিয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থার যোগদানের খবর জানা যাচ্ছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা সাড়ে তিনশ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নিউজপ্রিন্ট করখানা বসাচ্ছে। সোরোস-ফান্ড ম্যানেজ-ম্যান্ট-য়ের সাথে এক হাজার কোটি টাকার ইনফরমেশন টেকনোলজি পার্কের চুক্তি হয়েছে। সিঙ্গাপুরের কিছু সংস্থা নানান প্রকল্পে সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস প্রকল্পে যোগ দিচ্ছে সোরোস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ছত্রিশ'শ কোটি টাকা।

এমন আরো বহু চুক্তি সই হয়েছে। এবং এই ধরণের বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ নাকি প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকার মত হবে। পরিমাণটা খুব কম নয়। যদিও অনেকে সন্দেহ করছেন এর অল্পই বাস্তবে রূপায়িত হবে। কিন্তু আপাতভাবে দেখলে এই বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ নেই।—বিশেষ করে গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম-এর যুগে। মূলধন তো বিনিয়োগের অপেক্ষাতেই আছে। ভৌগলিক সীমানা নিরপেক্ষেই। আর এখন তো দুনিয়া-জুড়ে যা হাওয়া তাতে ঝুঁকিও বিশেষ নেই। তার ওপর যদি বিশেষ সুবিধের আশ্বাস থাকে, যদি মুনাফার গ্যারান্টি মেলে তাহলে আর বিনিয়োগে বাধা কি? সব দিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিনিয়োগের পক্ষে খুবই অনুকুল

এখন। বিদেশেও এই স্বীকৃতি মিলেছে। আমেরিকার বিশিষ্ট পত্রপত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন সম্ভাবনা নিয়ে রীতিমত সিরিয়াস প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। ফলে আগামী দিনে যদি একগুচ্ছ বহুজাতিক সংস্থা এই রাজ্যে এসে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে তো আশ্চর্যের কিছু নেই।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই। একসময় এই বিদেশী কোম্পানীদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। তার প্রমাণ সাতাত্তরের শিল্পনীতি। কিন্তু আজ তাদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে বহুজাতিক কর্পোরেশনের মালিকদের চরিত্র বদল হয়েছে? কই তেমন তো শোনা যায় না।—তাহলে?

[দীপঙ্কর দে ও শুভেন্দু দাশগুপ্ত প্রচারিত পুস্তিকা "Foreign Interests in India"-এর ফেব্রুয়ারী 1966 সংখ্যা এবং নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন—হচ্ছেটা কি? (1995)-"এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।] □

—রবীন চক্রবর্তী

ম্যাড-কাউ ডিজিস

পরিক্রমা

বিলিতী গরুদের মধ্যে এক ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। সে রোগ নাকি গোমাংসের মাধ্যমে মানুষের দেহেও সংক্রামিত হচ্ছে। মস্তিষ্কের এই রোগের পরিণতি মৃত্যু। লোক মুখে প্রচারিত এই রোগের নাম mad-cow disease। আতংকিত সারা ইওরোপের মানুষ। বিলিতি গরুর মাংস আমদানী একে একে সব দেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। প্যাকেট-ফুড ব্যবসায়ীরা তাদের খাবারের প্যাকেটে স্টিকার সেঁটে জানিয়ে দিচ্ছে—'No British Beef'।

বৃটিশ সরকারের মাথায় হাত। তাদের গোমাংস ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড়। বছরে যার পরিমাণ চারশ কোটি পাউন্ডের কম নয়। ফলে মন্ত্রী-আমলা পর্যায়ে বেজায় হুটোপুটি লেগে গেছে। অন্য দিকে বিরোধী লেবার পার্টিও এ নিয়ে হৈ চৈ শুরু করেছে। তাদের লক্ষ্য আগামী বছরের বৃটিশ পার্লামেন্টের ভোট।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। উনিশ'শ ছিয়াশী সালে। ইংল্যান্ডের গোখামারগুলোর গরুদের মধ্যে এক ধরণের রোগ দেখা দেয়। রোগের নাম Bovine spongiform encephalopathy বা সংক্ষেপে BSE। গত এক দশকে প্রায় দেড় লক্ষ গরু এই রোগাক্রমণে মারা গেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে এই রোগ কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশের গরুর মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা দেয়নি।

উনিশ'শ তিরানব্বই সালে বৃটেনে একজন ডেয়ারী কর্মী মারা যায় অনেকটা এই রোগের লক্ষণে। মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগের নাম Creutzfeldt—Jacob disease বা সংক্ষেপে CJD। বছরে গড়ে জনা পঁয়তাল্লিশ লোক মারা যায় এই রোগে। তবে তাদের বয়স কখনই ষাটের নীচে নয়। কিন্তু গত বছরের শেষের দিকে মারা গেছে দুজন অল্প বয়সী ছেলে। ষোল থেকে আঠেরোর মধ্যে যাদের বয়স। এবং বৃটেনের মেডিক্যাল জার্নাল 'ল্যানসেট' খবর দিয়েছে যে আরো জনা আটেক ছেলে এই রোগে আক্রান্ত এখন। এই রোগের উৎস এখনও ধরা পড়েনি। অনেক কিছুকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। যার মধ্যে BSE রোগাক্রান্ত গরুর মাংসও আছে।

ব্যস, বিপত্তির শুরু এইখানেই। শুরু হয়ে গেছে পাগলামো সারা

ইওরোপ জুড়ে। একদিকে বিলিতি গোমাংসের চাহিদা ধপাস করে পড়ে গেছে। অন্যদিকে ব্যবসার গুডউইল বজায় রাখতে বৃটিশ সরকার বলেছে তাদের বর্তমানের তাবৎ গরু কুল তারা ধ্বংস করে ফেলবে। নির্মূল হবে রোগ। তারপর নতুন করে শুরু করবেন গোমাংসের কারবার। অর্থাৎ হত্যা করা হবে প্রায় একশ কুড়ি লক্ষ গরু। এবং এজন্য ফার্ম মালিকদের ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে তিনশ কোটি পাউন্ড। কিন্তু এখানেই কি শেষ সমস্যার? কোথায় ফেলা হবে এই বিশাল পরিমাণ মৃত গরু? যেখানেই ফেলুক সেখান থেকে নানান পথ বেয়ে সেই রোগ আবার মানুষের খাদ্য-শৃংখলে ঢুকে পড়বে না তারই বা গ্যারান্টী কোথায়?

কি বীভৎস পরিকল্পনা! কিন্তু এই মতকায় যদি ওই ধনী দেশের লোকেদের মাংস খাওয়ার অভ্যাস কিছু কমতো তো পৃথিবীর মঙ্গল হতো। কারণ এই বিপুল পরিমাণ মাংসের জন্য গোখাদ্যের যোগান দিতে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে পৃথিবীর অন্য অংশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে। গোখাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শস্যের অনেকটাই উৎপন্ন হয় কিছু কিছু দরিদ্র দেশে। বিদেশী মুদ্রার লোভে সেখানে মানুষের খাদ্যের বদলে চাষ করা হচ্ছে গোখাদ্যের। সেখানে মানুষের খাদ্যাভাব। আর ধনী দেশের তাগড়া গরুদের প্রতি কেজি মাংসের জন্য ব্যয় হচ্ছে ষোল কিলোগ্রাম শস্য! সেই মাংস খাওয়া কিন্তু আমাদের মত কালে-ভদ্রে খাওয়া নয়। তাদের রোজকার খাবারের তালিকায় প্রধান খাদ্য মাংস। এবং প্রতিদিন! তাহলে ওই দেশের এক একজন মানুষ দানাশস্যের হিসেবে আমাদের কতগুণ খাচ্ছে ভাবুন। সুসান জর্জ তার বিখ্যাত বই How the other half dies—the real reason for world hunger-এর শুরুতেই তার দেশবাসীকে লক্ষ্য করে লিখেছেন—"...You have probably not been able to escape the charge that you eat too much meat and that you are therefore directly snatching life-giving grain from some poor baby in the sahel"

কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলিতি গরুর অভাবে ইওরোপীয়দের মাংস খাওয়া কমার সম্ভাবনা নেই। কারণ বিলিতি গরুর এই সর্বনাশের সংবাদে অস্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনার খামার মালিকরা উৎফুল্ল।—শূন্যস্থান পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই পাঁয়তাড়া শুরু করেছে তারা।

রিসাইক্লিং

কাঁধে চটের বস্তা, হাতে লোহার শিক এই নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফিরতে দেখা যায় বহু ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িদের। পথের ধারে জঞ্জাল ঘেঁটে কিসব সম্পদ খুঁজে ফেরে এরা। ছেঁড়া কাগজ, প্লাস্টিক টুকরো, ভাঙ্গা বোতল, টিনের কৌটো ইত্যাদি। রাজাবাজার কিংবা বেলেঘাটার খালধার ধরে হাঁটলে মাঝে মধ্যে চোখে পড়বে কাগজ, প্লাস্টিক, বোতল, কৌটো সব আলাদা আলাদা স্তুপাকার করে রাখা আছে। অর্থাৎ ঝোলাভর্তি কুড়নো জঞ্জাল অবশেষে এসব জায়গায় এসে সাময়িকভাবে জড়ো হয়।—অন্য কোথাও যাওয়ার অপেক্ষায়। আবার কোন কাজে লাগার অপেক্ষায়।

জীবিকার্জনের অন্য কোন উপায় না পেয়েই সম্ভবতঃ লোকে এমন পেশায় আসে। খুব একটা ভাল চোখে কেউই দেখে না এদের। অথচ নিজেদের অজান্তেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব বয়ে চলেছে এরা।—ফেলে দেওয়া জিনিসের পুনর্ব্যবহারে সাহায্য করছে।

আজকাল ফেলবার মত জিনিষের পরিমাণ খুবই বেড়ে গেছে। সুদৃশ্য প্যাকেট ভর্তি জিনিষ ঘরে ঢোকামাত্র এর সুদৃশ্য বহিরঙ্গটির স্থান হয় জঞ্জালস্তূপে। বহু জিনিষ আজকাল একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়ার রীতি। থ্রো এওয়ের জমানা এটা। এর মধ্যে একধরণের বাহাদুরি আছে যেন। যারা প্রস্তুত করছে এবং যারা ফেলে দিচ্ছে দু'পক্ষের কাছেই। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় অত্যন্ত জঘন্য বদভ্যাস এটা। এক ধরণের সামাজিক অপরাধও বটে। বিশেষকরে প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে যখন। অথচ পাঁচ টাকার জিনিষ দশ টাকার মোড়কে বিক্রি হচ্ছে। আর মোড়কটির স্থান হচ্ছে

জঞ্জালস্তূপে। পেপসি বা কোলার টিনের কৌটোগুলো গড়াগড়ি খেতে দেখা যাচ্ছে পথেঘাটে।

ফেলে দেওয়া প্যাকেট কৌটো প্লাস্টিক চামচ কাপ ডিস ইত্যাদির মূল্য কিন্তু আদৌ যে দরে বাজারে বিকোচ্ছে তা নয়। প্রকৃত মূল্য অনেক বেশী। যেসব কাঁচামাল লাগে তৈরী করতে, যে বিদ্যুৎ তথা জ্বালানী লাগে তা কিন্তু গাছের মত ফিরে ফিরে জন্মাবে না। একবার খরচ হওয়া মানে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। ফলে আগামী দিনের কথা মনে রাখলে মহার্ঘ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত এই প্রাকৃতিক সম্পদ। এবং উচিত এই অপচয়ী অভ্যাস পরিত্যাগ করা।

এই বদভ্যাস আমরা পেয়েছি পশ্চিমের ধনী দেশ থেকে। তবে সে দেশেও এখন প্রাকৃতিক সম্পদ সাশ্রয়ের আওয়াজ উঠেছে। এবং এই অপচয় কমানোর জন্য তারা রিসাইক্লিং-এর কথা বলছেন। একবার ব্যবহৃত জিনিষ ফেলে না দিয়ে পুনরায় তাকে প্রসেসিং করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার কথা বলছে। এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও তৈরী করছে।

আমাদের দেশে কিন্তু কখনই এধরণের অপচয়ী অভ্যাস মানুষের ছিল না। এখনও কেবল উচ্চবিত্ত লোকেদের মধ্যেই আছে। এখানে ফেলে দেওয়া জিনিষ নানানভাবে নানান স্তরে ব্যবহার হয়েই থাকে। তারপর জঞ্জালে পরিণত হওয়া জিনিষ থেকেও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বস্তু-সামগ্রী খুঁজে বার করছে কিছু লোক। ওই জঞ্জাল কুড়ুনি লোকেরা। ফলে তাদের এই উপকারী ভূমিকার স্বীকৃতি থাকা উচিত।

সম্প্রতি তেমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 'ফোকাস' নামের এক সংগঠন। এরা জঞ্জালকুড়ুনি লোকেদের নিয়ে একটি কোঅপারেটিভ গড়েছেন। উদ্দেশ্য এদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সংগৃহীত বস্তুসামগ্রীর উপযুক্ত মূল্য পাওয়া নিশ্চিত করা। তবে এদের এখন আর পথের জঞ্জাল ঘাঁটতে হচ্ছে না। বাড়ী বাড়ী গিয়ে সংগ্রহ করে আনছে জঞ্জাল। পরিস্কার ব্যাগে করে। দু'ভাগে। একভাগে তরিতরকারি ইত্যাদির ফেলে দেওয়া অংশ। আর অন্য ভাগে কাগজ প্লাস্টিক ইত্যাদি শুকনো জিনিস। এদের প্রত্যেকের সাথে থাকছে কোঅপারেটিভ থেকে দেওয়া পরিচয়-পত্র। আপাততঃ কাজ করছে তিলজলার একটি হাউসিং এস্টেটের মধ্যে। এমন উদ্যোগ অন্যত্রও গড়ে উঠবে আশা করি।

সেলুলার ফোনের হাল

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সেলুলার ফোন কানে দিয়ে রাস্তার লোক দেখতে দেখতে কথা বলে চলেছেন কেউ, এমন দৃশ্য কলকাতার পথে ঘাটে এখন আর বিরল নয়। সেলুলার ফোন এখন স্ট্যাটাস সিম্বল। হাতে বা কানে ধরা সেলুলার নিয়ে ঝকঝকে চেহারার লোকের বিজ্ঞাপন এখন সর্বত্র। বিশেষ করে টিভি সিরিয়ালগুলো তো এখন ঘরের ইন্টেরিয়র ডেকরেশনের সাথে সেলুলার ফোনেরও বিজ্ঞাপন। ঘন ঘন ট-রি-রি টি-রি-রি হচ্ছে। আর পাত্র-পাত্রীরা হেঁটে চলে দুলে দুলে কথার ভঙ্গি করছে। হঠাৎ হলো কি দেশটার? পথে-ঘাটে চলতে ফিরতেও যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে দূরের লোকের সাথে? সেলুলার ফোন দেখছি চোখের চশমার মতই কানের ভূষণ হয়ে উঠছে।

তবে লন্ডনে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়েছে। লোকে এটাকে উৎপাত বলে মনে করছেন। বিশেষ করে প্রকাশ্য স্থানে ব্যবহারটা। ক্লাবে, হোস্টেলে, পার্কে, রেস্টুরেন্টে, লাইব্রেরীতে—বা এধরণের অনেক জায়গায় সেলুলার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এখন। বাইরে ব্যবহার করতে হলে একটু আড়ালে করতে হচ্ছে। নতুবা চোখে পড়লে লোকে নাকি কেমন কেমন ভাবে দেখে। এখন প্রকাশ্য স্থানে এটা ব্যবহার করে বিশেষ কিছু পেশার লোকজন। যেমন, ট্যাক্সিচালক, দোকানের লোক, ময়লা সাফের লোক ইত্যাদি।—কাজের প্রয়োজনেই ব্যবহার করতে হয় এদের।

আসলে ও দেশে সেলুলার ফোনের দর এখন এতই কমে গেছে যে রাম, শ্যাম, যদু-মধু সকলেই ব্যাবহার করতে পারে। এবং করেও। ফলে পয়সাওলা লোকের কাছে এর কদর গেছে কমে। এটা আর স্ট্যাটাস সিম্বল নয়। এতই তুচ্ছ যে বড় বড় সুপার মার্কেট গিফ্‌ট হিসেবেই বিলোচ্ছে এই সেলুলার ফোন।

—র. চ.

মহিলা যৌন-কর্মী সম্মেলন

প্রতিবেদক

গত তিরিশে এপ্রিল '96 তারিখে কলকাতার ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গের মহিলা যৌন-কর্মীদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন। উদ্যোক্তা ছিল তাদের সংস্থা 'মহিলা সমন্বয় কমিটি'। প্রায় বারো'শ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন এই সম্মেলনে। এবং অনেকেই বর্ণনা করেছেন তাদের দুঃখজনক জীবনের কাহিনী, জানিয়েছেন প্রতিনিয়ত তাদের কত দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হতে হয়—শুধুমাত্র এই পেশায় নিযুক্ত বলেই। এমন কি তাদের বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করা নিয়েও কত সমস্যা—"খান্‌কীর বাচ্চা" বলে। —বললেন একজন।

বহু দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই সম্মেলনে। উল্লেখযোগ্য একটি হল আর পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের মত তাদেরও যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে—সরকার এটা স্বীকার করুন। যৌন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা তাদের উদ্ধারের নামে নানান 'কর্তৃপক্ষে'র হাতে যে তাদের প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত হতে হচ্ছে এ অবস্থার অবসান চান তারা। তাদের দিয়ে যা খুশি করানো, অর্থ আদায় করা ইত্যাদি নানান কায়দায় চলে জুলুম। তাদের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে চায় যারা তাদের মধ্যে মস্তান পুলিশের সাথে রয়েছে বহু ভদ্রবেশী প্রতারকও। দেহ ব্যবসা সংক্রান্ত আইনের সংশোধন না হলে এ অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব—জানেন এরা। তাই আইনের সংশোধন চেয়েছেন তারা।

এই বিপুল সংখ্যক মহিলারা যে অপমান অসম্মানের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবর থেকে প্রকাশ্য মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। সমস্ত রকম নিপীড়ণের বিরুদ্ধে যে বহুমুখী সামাজিক আন্দোলন চলছে, এই আন্দোলন তারই একটি অংশ হয়ে উঠলে সকলেই খুশি হব আমরা। এবং সেই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গেল এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবস্থার বিপাকে পড়ে এই ব্যবসায় আসতে হয় এদের। এটা লজ্জার নয়। বরং বাধ্য হয়ে এই দেহ-বিক্রির ব্যবসায় যে আসতে হচ্ছে এদের, এটা সামাজিক লজ্জা। অথচ এদেরকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর যারা এদের ওপর উৎপীড়ন চালিয়ে ফায়দা লোটে তারা ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়ান। এই সামাজিক ভন্ডামীর বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এই সম্মেলন। নিছক স্বাচ্ছন্দ্য আর ক্ষমতার লোভে আমাদের চারপাশের তথাকথিত বহু ভদ্রলোকেরা যে অজস্র দুষ্কর্ম করে চলেছে প্রতিনিয়ত তার চেয়ে পেটের দায়ে এই দেহ বিক্রির কাজটা অনৈতিক নয়। এই সম্মেলন সেটা দেখিয়ে দিয়েছে।

যৌন কর্মীদের সংগঠিত করার কাজে আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহায়তার কথা সকলেই জানেন। আশা করা যায় এক ধরণের নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে অন্য কোন নিয়ন্ত্রণের না শিকার হন তারা, সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে তাদের সংস্থা। প্রচারমাধ্যমে এঁদের সংগঠিত হওয়ার কথা প্রায়ই প্রকাশিত হয়। মিডিয়ার চরিত্র সম্পর্কে আমরা কম বেশী সকলেই ওয়াকিবহাল। এদের প্রবণতা যৌথ উদ্যোগের মধ্য থেকে ব্যক্তিবিশেষের ইমেজকে বড় করে তুলে ধরা। সে লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা এই উদ্যোগের পক্ষে মঙ্গল।

একটি বিষয়ে খট্‌কা লাগল। এই সম্মেলনে এমন একজন নিমন্ত্রিত মহিলাকে বক্তব্য রাখতে দেখা গেল যিনি কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে ধর্ষিতা এক দরিদ্র মহিলার 'চরিত্র' নিয়ে কটাক্ষ করে দুষ্কৃতকারীদের অপরাধ হাল্‌কা করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে ওনার উপস্থিতি বড়ই বেমানান লাগল।

এই সম্মেলনের আয়োজক সংস্থার সাথে যোগাযোগের জন্য কয়েকটি নাম ঠিকানা দেওয়া হল।

1. মিনু পাল, 22 ইমাম বক্স লেন, কলকাতা-6 ;
2. সাধনা মুখার্জী, 1 দয়াল মিত্র লেন, কলকাতা-6 ;
3. মাধব জয়সওয়াল, 66/ই প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-12 ;
4. বাচ্চু দত্ত, 173 কালিঘাট রোড, কলকাতা-26 □

অর্চনা মামলা

ধৈর্য সাহস এবং আত্মত্যাগের মূল্যে অর্জিত জয়

অবশেষে অর্চনা মামলার রায় বেরিয়েছে। দীর্ঘ ঊনিশ বছরের আইনী লড়াইয়ের শেষে। নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই মামলা। স্মরণীয় হয়ে থাকবে অর্চনাদের গোটা পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী এই লড়াইয়ের ইতিহাস। এই মামলা একটি মহৎ সামাজিক দায়িত্ব পালনেরও দৃষ্টান্ত। এজন্য ওদের গোটা পরিবারটিকে যে পরিমাণ সাহস ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, যে পরিমাণ ভয়ভীতি প্রদর্শনের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যে পরিমাণ আর্থিক ও মানসিক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে ঊনিশ বছর ধরে, তার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি আমরা, বিওবি-র বন্ধুরা।

আমাদের দেশে পুলিশের হাতে বিনা অপরাধে অত্যাচারিত হতে হয় কত না মানুষজনকে। কিন্তু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান কতজন ? প্রায় কেউ না। পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার শেষে সে শক্তি ও সাহস অবশিষ্ট থাকে না প্রায় কারুরই। অর্চনার পরিবারের লোকজন সে সাহস দেখিয়েছে। যারা প্রায় সকলেই অত্যাচারিত হয়েছে পুলিশের হাতে। কিছুদিন আগে আর পরে।

অর্চনার পরিবার বলতে সেদিন ছিল তার বৃদ্ধা মা সুধাদেবী, তার ভাইয়ের স্ত্রী লতিকা এবং ভাই সৌমেন। যেদিন মাঝরাতে পুলিশ হানা দেয় তাদের বাড়ী, সেদিন সৌমেন বাড়ীতে ছিল না। ছিল চারজন মহিলা। উপরোক্ত তিনজন আর তাদের এক বন্ধু গৌরী। এছাড়া ছিল দুটি শিশু।

পুলিশ ওদের বৃদ্ধা মা আর শিশু দুটিকে রেখে বাকি তিনজনকে তুলে নিয়ে যায় ঊনিশশো চুয়াত্তর সালের সতেরই জুলাইয়ের মধ্যরাত্রে। এদের অপরাধ, এরা সৌমেনের পরিবারের লোকজন। সৌমেনকেই খুঁজছিল পুলিশ। তার অপরাধ সে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। যে আত্মীয়-পরিজন-গৃহ-চাকুরির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অন্য অনেকের মত তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে।

এই তিন কন্যা-বধূ ও তরুণীকে পুলিশ নিয়ে যায় লালবাজার থানার সেই ভয়ংকর কুঠুরিতে। যে কুঠুরি টর্চার চেম্বার নামে কুখ্যাত। শুরু হয় অত্যাচার। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঠ্যাঙ্গাড়ে পুলিশ দিয়ে। হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে। লাঠির বাড়ি, চুল ধরে টানা, জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা, কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি, অকথ্য গালিগালাজ, ধর্ষণের ভয় দেখানো—কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এই ঠ্যাঙ্গাড়েদের নেতৃত্বে ছিল পুলিশ অফিসার রুণু গুহনিয়োগী। সৌমেন কোথায় আছে জানার জন্য এই অত্যাচার। কিন্তু কথা তারা বার করতে পারেনি। অত্যাচারের চাপে বারবার সংজ্ঞা হারিয়েছে তারা। দিনের পর দিন অত্যাচারের ফলে এদের শরীরে দেখা দিয়েছে নানান উপসর্গ। এবং পরবর্তীকালে এক সময় চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে অর্চনা। প্যারাপ্লেজিয়ায় অবশ হয়ে যায় তার গোটা নিম্নাঙ্গ। এরপর সৌমেনও ধরা পড়ে পুলিশের হাতে এবং তার ওপরেও হয় অমানুষিক অত্যাচার। দেহের নানান ক্ষত আজও যার সাক্ষী।

এই অত্যাচার এদের দেহকে পঙ্গু করলেও মানসিক শক্তি হরণ করতে পারেনি। যেজন্য এত কষ্ট স্বীকার করেও চালিয়ে গেছে মামলা। এ কোর্ট সে কোর্ট ঘুরেছে। মেট্রোপলিটান-সেশন-হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েছে। নানান কায়দায় কালক্ষেপ করেছে আসামীপক্ষ। কিন্তু হাল ছাড়েনি এরা।

লড়াই কেবল এদের একজন পুলিশের বিরুদ্ধেই করতে হয়নি। লড়তে হয়েছে পুলিশ-গুন্ডা-প্রশাসন এই যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে। এমন একজন কুখ্যাত পালিশকে আড়াল করতে লোকের অভাব হয়নি প্রশাসনে। এটা দুভাগ্যজনক হলেও সত্য যে অত্যাচারের ঘটনা যদিও ঘটেছিল রাজ্যে কংগ্রেসী সরকারের আমলে কিন্তু মামলা পর্বে ক্ষমতায়

ছিল বামফ্রন্ট সরকার। তবুও রুণুর অসুবিধে হয়নি। বরং পুরস্কৃত হয়েছে সে। চাকুরিতে হয়েছে উন্নতি।

অর্চনা মামলার পক্ষে উকিল ছিলেন একজন নামকরা আইনজীবি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বে এসে কিছু মতবিরোধ হওয়ায় তিনি এই মামলা চালাতে অস্বীকার করেন। তখন মামলা কাঁধে তুলে নেয় সৌমেন নিজেই। সৌমেন কোন কালেই আইনের ছাত্র ছিল না। তথাপি মামলার দায়িত্ব নিয়ে যে পরিমাণ সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার।

শুরু হয় আর এক লড়াই পর্ব। আইনের বই জার্নাল দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ ও অধ্যয়ন পর্ব। মামলার বিষয় খুঁটিয়ে বিচার করতে বসে ও দেখতে পায়, মামলা সাজানোয় রয়ে গেছে নানান ত্রুটি। ফাঁক ফোঁকড়। পেশাদার আইনজীবির কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত নয়। ফলে কাজটা হয়ে পড়ে আরও দুরুহ!

কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য্য এবং যত্নের সাথে এই সমস্ত ফাঁক-ফোঁকড় সামলে তোলে সৌমেন। মামলার সপক্ষে গড়ে তোলে অজস্র দৃষ্টান্তসহ যুক্তি ও আইনের নিটোল বেড়াজাল। যা আসামী পক্ষের আইনজীবির পক্ষে ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। এই মামলার সওয়াল পেশ করার সময় আদালত কক্ষে হাজির ছিলেন যারা, জানেন সে কথা। এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুর্যেন্দু বিশ্বাস তার ঐতিহাসিক রায়ে সৌমেনের দেওয়া প্রত্যেকটি যুক্তি বিশ্লেষণ এবং আইনের ব্যাখ্যা যথাযথ বলে স্বীকার করেছেন। এজন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে সৌমেন।

এই মামলার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পুলিশ হাজতে পারিবারিক নির্যাতনের ফলেই যে অর্চনা পঙ্গু হয়েছিল সে বিষয়টি প্রমাণ করা। কাজটা সহজ নয়। এমনিতে পুলিশ হাজতে অত্যাচারের চিহ্ন না রেখে নির্যাতনের কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এজন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থাও আছে। অন্যদিকে বিদেশের কয়েকটি সংস্থা আবার গবেষণা করছেন বাহ্যিক চিহ্ন না থাকলেও শারিরিক নির্যাতনের ঘটনা কিভাবে প্রমাণ করা যায়। রীতিমত জটিল শরীরবৃত্তীয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্রসম্মত গবেষণা সেসব। এই সব দুর্লভ গবেষণাপত্র অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হয়েছে এই মামলার জন্য। এবং এই সমস্ত জটিল তথ্য প্রমাণ যুক্তিগ্রাহ্য করে হাজির করতে হয়েছে আদালত সমীপে।

এই মামলার শেষে সকলকে স্বীকার করতে হবে যে আদালতের ইতিহাসে এক বিরল নজির সৃষ্টি হল। ধৈর্য্য ও সাহস থাকলে যত প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী দুর্বৃত্তই হোক না কেন তার শাস্তির বিধান আদায় করে নেওয়া সম্ভব। আর আইনজীবির পক্ষ থেকে সহযোগিতার অভাব ঘটলে নিজেদের মামলা নিজেরাই চালানো যায়। এবং এই মামলায় আদালত কক্ষে দু'তরফের সওয়াল যারা শুনেছেন তারা স্বীকার করবেন সৌমেনের সওয়াল তথ্য ও যুক্তির দিক থেকে অনেক উন্নতমানের হয়েছে। পেশাদার আইনজীবি কেউ এত যত্ন করে এবং এত বিশাল পরিমাণ তথ্যের সমাবেশ করে সওয়াল করতেন কিনা সন্দেহ।

দীর্ঘ সময় ধরে চলা মামলার বিভিন্ন পর্বে অর্চনা-সৌমেন-লতিকাদের বহু দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছু কিছু পরিচিতজনেরা দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে না পারায় তাদের বহু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে। একথা যেমন সত্য তেমনি কিছু কিছু বন্ধু ওরা সব সময়ই পেয়েছে যারা আর কিছু না হোক তাদের পাশে থেকেছে। দিনের পর দিন আদালতে হাজির থেকেছে। সংখ্যায় তারা কম ছিল। এবং এই ঐতিহাসিক মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী চারপাশের মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণ সংবেদনশীলতা প্রত্যাশিত ছিল তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি কোন পর্বেই। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আজ মামলার শুভ পরিণতির শেষে এই ত্রুটি অনেকেই অনুধাবন করবে সন্দেহ নেই।

এই জয়ে উল্লসিত আমরা। বিশেষ করে কারণ সৌমেনরা আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং সৌমেন বিওবি-র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত প্রায় শুরু থেকেই।

—র. চ. □

আমাদের কথা

(2 এর পাতার পর)

আবার অন্যভাবে দেখলে এও সত্য নয় কি যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির এমন লাগামছাড়া বিকাশের সুযোগ যদি না থাকতো তা'লে কি মানুষ রোগ, ব্যাধি, ক্ষুধার হাত থেকে উদ্ধারের এত উপায় খুঁজে পেত? পারতো জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এমন উন্নতি ঘটাতে? মানুষ তো জন্তু নয়। মানুষের জ্ঞানের স্পৃহাকে কোন্ নীতিবোধের বর্ম দিয়ে ঠেকানো যেতো? কোন সেই নীতিবোধ যার আশ্রয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে লক্ষণ-রেখা দিয়ে বিপদ সীমানা নির্দ্ধারণ করা যায়? আবার যতদূর এগিয়েছে মানুষ এখান থেকে তো ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন নেই? তাহলে অধীত জ্ঞানের ঝাড়াই-বাছাই কিভাবে হবে, কে করবে? সব থেকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন হল—প্রমাণিত পথ ও পদ্ধতি ভবিষ্যতের পক্ষে যত বিপজ্জনকই হোক, দুরন্ত মানুষকে কি বলা যায়—'এ চড়ায় উঠো না, অন্যত্র দেখ'? এতসব প্রশ্নের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে এগুনো সহজ নয়। তবুও চেষ্টা করে দেখায় ক্ষতি কি? তাই শুরু করা।

তাই সকলের কাছে আবেদন এই আলোচনা শুরু করা এবং চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসুন। নানাভাবেই চলতে পারে এই চর্চা। যেমন, মুখোমুখি বসে আলোচনার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে আমাদের জানালে দিনক্ষণ স্থান স্থির করে দু'চারজন বন্ধুবান্ধব জড়ো হয়ে শুনবো আপনার বা আপনার পরিচিত কারো কথা। যদি মনে করেন লিখে জানাবেন—তাহলে লেখা পাঠান। বিওবি-তে প্রকাশ করব সে লেখা। মতামত চাইব সবার। আপনি আপনার পরিচিত জনদের বলুন একথা। আমরা সবার কথা শুনতে জানতে আগ্রহী।

ইতিমধ্যেই মৌখিক প্রস্তাবে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন আমাদের এক বন্ধু—একটি লেখা নিয়ে। লেখাটি এই সংখ্যায় ছাপা হল। অমিতাভ বসুরায় নিয়মিত লিখিয়ে নন। তবুও জরুরী মনে করেছেন এই আলোচনায় অংশ নেওয়া। আমাদের বিশ্বাস এই লেখায় এমন অনেক কিছু বলা হয়েছে যা নিয়ে মতামত জানানোর সুযোগ আছে।

আমাদের আর এক বন্ধুও এগিয়ে এসেছেন সাগ্রহে। শুভেন্দু দাশগুপ্ত নিজে জানিয়েছিলেন কিছু বলবেন বলে। বলেছেনও একদিন। আমরা কিছু বন্ধু জড়ো হয়ে শুনেছি তার কথা। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্ব-জনীনতা, Objectivity ইত্যাদি দাবীর যথার্থতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। জ্ঞানচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে এক ধরনের নীতিবোধের জোরালো নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ছিল এক সময় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে। আধুনিককালে যা অবর্তমান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নীডহ্যামের বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করেন। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হবে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ও টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন। বিওবি, প্রযত্নে—সুভাষ গাঙ্গুলী, B-22/8 করুণাময়ী হাউসিং, সল্টলেক, কলকাতা-700091। টেলিফোন: 359-0297

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক এ, কলকাতা-700089

আর এন 34929/79
অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জানুয়রী-মার্চ '96

> গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন। কিছু কিছু পুরনো সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে লিখুন।

> লেখা পাঠান। সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কের যে কোন বিষয়ে। স্থানীয় সমস্যা ভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান সমীক্ষা ইত্যাদি সাদরে বিবেচিত হবে।

> এজেন্সী দেওয়া হয়। একসঙ্গে অন্তত পাঁচ কপি। কমিশন 25%।

যাঁরা কাজ করেছেন ঃ কম্পোজ ☐ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন, দুলাল বোস ।। মেক-আপ ☐ স্বপন সেন ।।
মেশিনম্যান ☐ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ।। বাইণ্ডিং ☐ লক্ষণ দাস ।। মুদ্রক ☐ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বির পক্ষ থেকে ঃ প্রদীপ, রবীন চক্রবর্তী ও রবীন মজুমদার।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি,
117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাত-9 থেকে মুদ্রিত, ফোন ঃ 350-7967।